ISSN: 2348-487X

Ebong Prantik

এবং প্রান্তিক

An International Refereed Multi-Disciplinary Journal
DIIF Approved Impact Factor : 2.29
Vol. 6th Issue 1st, January, 2019

সম্পাদক
আশিস রায়

এবং প্রান্তিক

An International Refereed Multi-Disciplinary Journal
DIIF Approved Impact Factor : 2.29
Vol. 6th Issue 1st, January, 2019

সম্পাদক
আশিস রায়

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
An International Refereed Multi-Disciplinary Journal (ISSN : 2348-487X), Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya, Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150, Vol. 6th Issue 1st, January 2019, Rs. 200/-
E-mail : ashis.jibonda.roy@gmail.com
Website : http://ebongprantik.wordpress.com

প্রকাশ
৬ষ্ঠ বর্ষ ও ১ ম সংখ্যা
২৮ জানুয়ারি, ২০১৯

ISSN : 2348-487X

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিষ্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য
২০০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, ড. সনৎকুমার নস্কর,
ড. বিকাশ রায়, ড. শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী

প্রধান সম্পাদক

ড. আশিস রায়

সহ-সম্পাদক

ড. আকাশ বিশ্বাস, ড. টুম্পা ব্যাপারী,
ড. আশীষকুমার সাউ, প্রণব নস্কর, ইনতাজ আলি, সুজয় সরকার

সম্পাদনা সহযোগী

ড. অচিন্ত্য চ্যাটার্জি (ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়),
ড. অলকেশ দত্ত রায় (বৈজ্ঞানিক, ফার্মাসিউটিক্যাল, বোস্টন),
ড. তানিয়া হোসেন (ওয়েসদা বিশ্ববিদ্যালয়),
ড. সৌমিত্র বসু (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়),
ড. হোসনে আরা জলী (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়),
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়),
ড. মোনালিসা দাস (কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়),
ড. চন্দন আনোয়ার (নোয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়),
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। অনধিক ৪০০০ শব্দ সংখ্যা এবং সঙ্গে ৪০০/৫০০ শব্দের সারাৎসার পাঠাতে হবে।

২. পেজমেকার/ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠানো যাবে। ১৪ ফন্টে লেখা পাঠাতে হবে এবং সঙ্গে পি ডি এফ ও সফট কপি (লেখা নির্বাচিত হলে) পাঠাতে হবে। হাতে লেখা হলে মার্জিনসহ পরিচ্ছন্ন লেখা পাঠাবেন।

৩. অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না। লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।

৪. পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।

৫. কোনো লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে কিনা তা জানতে ৩/৪ মাস সময় লাগতে পারে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২
ফোন: ৯৮০৪৯২৩১৮২

Registered Address
Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 9804923182
E-mail : ashis.jibonda.roy@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস
ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৬০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে

প্রাপ্তিস্থান
দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন
Website : http://ebongprantik.wordpress.com

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৭

গেঁড়ি গুগলি- প্রসঙ্গ জনজাতি গোষ্ঠী : বিভূতিভূষণের সাহিত্যে

মনোজ মণ্ডল ৯

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বোধন' নাটকে দুর্গা

টুম্পা রায় ব্যাপারী ১৮

পাটচাষ কেন্দ্রিক ভাষা ও সংস্কৃতির কথা : প্রেক্ষিত উত্তর ২৪ পরগণা জেলা

এ টি এম সাহাদাতুলা ২৪

নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের ধারায় মানিকের 'পদ্মানদীর মাঝি' ঃ প্রতি তুলনা

জ্যোৎস্না দত্ত ৩৪

বাংলার লোকসংস্কৃতি ও সমাজ ভাবনায় বোলানগানের রংপাঁচালী

দীপক মণ্ডল ৪৫

সাম্প্রতিক নদী বাঁধ সমস্যার একটি কল্পিত পূর্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মুক্তধারা"

দেবরাজ হাওলাদার ৫০

নাট্যকার শম্ভু মিত্রের রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক অনুষঙ্গ

সন্তু মণ্ডল ৫৮

উত্তর দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতিতে রামকথার পরম্পরা

সঙ্গীতা প্রামানিক ৬৫

'বহিপীর' নাটক : মূল্যবোধের সংঘাত

আশিস রায় ৭৫

Bengal's Day of Challenge, Persistence and Sacrifice: A brief Historical Study

Ajanta Biswas ৮২

A Comparative Assessment on ICT Accessibility among the Government...
Nirmal Kumar Guchhait & Payel Banerjee ৮৯
From Above the Cloud Line
Aniruddha Sarkar ১০১
West Bengali Muslims Gaved For Partition
Chandrabali Das ১০৭
Place of Individual Liberty in Socio-Political Aspect
Kalpita Nandi ১২৪
The British Colonial Motives Änd Its Impacts On The Silk Industry...
Hoque Sabiruddin ১৩১

সম্পাদকীয়

শব্দ বুননের মধ্য দিয়ে চলে নূতনের আগমন। চিত্রকল্পে উঠে আসে নতুন বর্ণ, নতুন রঙ। সকলেই নিজের মত করে চেতনার রঙে রাঙায়িত করতে চায় বিনা আড়ম্বরে। বাস্তবরসের ছোওয়া যেমন থাকে তাতে, তেমনই যুক্তি, বুদ্ধির মেলবন্ধন ঘটে। আর সেখানেই নিষ্ঠাবান আলোচকের নথিবন্ধ করার প্রচেষ্টা।

গেঁড়ি গুগলি- প্রসঙ্গ জনজাতি গোষ্ঠী : বিভূতিভূষণের সাহিত্যে

মনোজ মণ্ডল*

সার-সংক্ষেপ (Abstract) :

গেঁড়িগুগলি জংলি শাকপাতা কচুকন্দ ইত্যাদি তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষের খাদ্য হিসেবে পরিচিত। সাধ করে নয়, জীবনের তাগিদে তারা এগুলি খেতে বাধ্য হয়। গেঁড়িগুগলি মূলত হাঁসের খাদ্য। জনজাতিগোষ্ঠীর মানুষেরাও এগুলি খেয়ে জীবন ধারণ করে। এই খাদ্যের রন্ধন প্রণালী পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়েছে স্বাদুতার কথা মাথায় রেখে। এখন শুধু জনজাতিগোষ্ঠী নয়, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, হাওড়ার অনেক সাধারণ মানুষও সখ করে এই খাদ্য ভক্ষণ করে। বিভূতিভূষণের সাহিত্যেও নিম্নবর্গের মানুষদের খাদ্য তালিকায় গেঁড়িগুগলির প্রসঙ্গ কিভাবে কতটা আছে, তারই অন্বেষণ রয়েছে এই নিবন্ধে।

সূচক শব্দ (Key word) : জনজাতিগোষ্ঠী, বিভূতিভূষণ, গেঁড়িগুগলির চচ্চড়ি, অপরাজিত, আরণ্যক।

''ও বললো – কি তোলচো, ও খুকি?

মেয়েটি বললে – গুগলি–

–কি হবে?

মেয়েটি সলজ্জ হাস্যে বললে – খাবো।

–কি জাত তোমার?

–বাউরি।''[১]

কিংবা

''দুর্গা-প্রতিমার মত রূপসি একটি গৃহস্থ বধূ ছেঁড়া কাপড় পরণে শামুক পোতার বিলে হাঁটু জল ভাঙিয়া চুপড়ি হাতে গুগ্‌লি তুলিতেছে–''[২] —

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু গল্প-উপন্যাসে এমন দৃশ্য বিরল নয়। স্থান-কাল-জাতি গোষ্ঠীভেদে মানুষের খাদ্যাভ্যাসের তারতম্য লক্ষ করা যায়। গোষ্ঠীভেদে

*সহঅধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খিদিরপুর কলেজ।

মানুষের খাদ্যরুচির সঙ্গে জলবায়ু ও প্রকৃতি জড়িয়ে আছে। বনজঙ্গল, পাহাড়, নদী, সমতলভূমি, শীত-গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চল বিশেষে খাদ্যরুচির পরিবর্তন ঘটে। আবার আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে খাদ্যাভ্যাস নিজেরা নিজেদের মতোই গড়ে নিয়েছে। উচ্চকোটির সঙ্গে নিম্নকোটির জনগণের মধ্যে খাদ্যভাসের পার্থক্য রয়েছে। সেই সঙ্গে পেশা জাতিগত কারণেও খাদ্যাভ্যাসের পরিচয় মেলে। বিভূতিভূষণ তাঁর গল্পে কিংবা উপন্যাসে গুগলির কথা বলেছেন, সে গুগলি বা শামুক সব জাতিগোষ্ঠীর খাদ্য নয়। আমাদের দেশের তথাকথিত নিম্নশ্রেণি ও আদিবাসী গোষ্ঠীর একটি অংশ শামুক, গেঁড়ি গুগলি-ঝিনুক খেয়ে জীবনধারণ করছে সেই কোন আদিমকাল থেকে। আর এমন সব খাদ্যের পশ্চাতে প্রাচীন সামাজিক বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে অর্থনৈতিক কারণও জড়িত ছিল। যেদিন থেকে পেশা ও বৃত্তিকেন্দ্রিক জাত ব্যবস্থার সূচনা হয় সেদিন থেকেই মানুষের জীবন ধারণের সঙ্গে খাদ্য সংস্কৃতিরও মেলবন্ধন ঘটে। আমরা জানি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পোষক ও অনুসৃত গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার সঙ্গে তথাকথিত শূদ্র ও আদিবাসী সমাজের সহাবস্থান ছিল না। সমাজ-সংগঠনের তত্ত্ব অনুযায়ী–

''মানব শিশু তার জৈবিক প্রয়োজন সমন্বিত অবস্থায় একটি জৈবিক সত্তারূপে এই পৃথিবীতে পদার্পণ করে। তার এই জন্ম কোন না কোন মানব সমাজের মধ্যেই ঘটে থাকে। সেই সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এই শিশু ধীরে ধীরে একটি সামাজিক জীব হিসেবে রূপলাভ করতে থাকে। ঐ বিশেষ সমাজের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী তার মানসিকতা গড়ে ওঠে এবং সামাজিক রীতি-পদ্ধতির মধ্যে তার ক্রমিক বিকাশ ঘটে থাকে। কাজেই দেখা যায় কোন সমাজে জন্মলাভ করে একটি শিশু যখন ধীর গতিতে পূর্ণবয়স্ক মানুষে রূপান্তরিত হয় তখন তাকে নানা সামাজিক ভাবধারা গ্রহণ করতে হয় এবং সমাজের একজন বিশিষ্ট সদস্য হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করে তুলতে হয়।''[৩]

সমাজের সদস্য হিসেবে একজন মানুষকে তার গোষ্ঠীগত 'প্রয়োজনীয় অভ্যাস, নৈপুণ্য, বিশ্বাস এবং বিচার বুদ্ধিলাভের শিক্ষা গ্রহণ করে' আর এই গোষ্ঠীগত চেতনা থেকেই মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি সহ জীবনাচরণের প্রয়োজনীয় দিকগুলিকেও অনুসরণ-অনুকরণ করতে দেখা যায়। আমাদের দেশের জনজাতিদের জীবনধারণেও তাই খাদ্যভ্যাসের ক্ষেত্রে এমন কিছু বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়– যা তাঁদের গোষ্ঠীগত তথা সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়। যেমন ধরা যায় জাতি হিসেবে 'বাগদী' সম্প্রদায় একটি প্রাচীন জনজাতি। যাদের খাদ্য তালিকায় গেঁড়ি, গুগলি, শামুক, ঝিনুক স্থান করে নিয়েছে। অন্যকোনো সম্প্রদায় মনে করেন গেঁড়ি, গুগলি, শামুক-ঝিনুক প্রভৃতি

অভোক্ষণীয় ও ম্লেচ্ছ জাতীয়দের খাদ্য। কেন তাদের খাদ্যে এমন জলজ প্রাণী স্থান করে নিয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে এই বাগদী জাতির এক সময়ে পেশাই ছিল মৎস্য শিকার করা। সে জন্য কোনো কোন অঞ্চলে এদের পরিচয় 'মেছো বাগদী' হিসেবে। মাছধরা এদের জীবিকা বলে এমন একটি তক্‌মা তাদের দেওয়া হয়েছে। অথচ দেখা যাচ্ছে এক সময় গেঁড়ি, গুগলি, ঝিনুক, শামুক, জংলি শাক-পাতা খেতে বাধ্য হয়েছে মানুষ। মন্বন্তরে কি না ভক্ষণ করেছে মানুষ। কিন্তু গেঁড়ি, গুগলি, শামুক অন্য সম্প্রদায়ও খেতে বাধ্য হয়েছে পেটের ক্ষুধা নিবারণে। মানুষের খাদ্য তালিকায় কি না থাকে। তবুও আমরা জনজাতি সম্প্রদায়ের খাদ্য-রুচি বিশেষের রন্ধন প্রণালীর দিকে পর্যবেক্ষণে লক্ষ করেছি—তাদের রন্ধন প্রণালীর ক্ষেত্রে রয়েছে নিজেদের খাদ্যকে সুস্বাদু করে তোলার কিছু পদ্ধতিও। বাউড়ি-বাগদিসহ অন্যান্য জনজাতিদের রন্ধন পদ্ধতি গেঁড়ি, গুগলি, শামুক ও ঝিনুককে উপাদেয় খাদ্যে পরিণত করা হয়। স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্যও বটে। গেঁড়ি, গুগলির ডালনা, ঝাল-চচ্চড়ি, টক প্রভৃতি রান্না করে খাওয়া হয়। এমন একটি প্রোটিনযুক্ত খাবার জনজাতিদের স্বাস্থ্যকে সবল করে তুলতেও সাহায্য করে। 'অশনিসংকেত' এ ভূষণ ঘোষের বৌ-এর কাছে অনঙ্গ বৌ জানতে চেয়েছে এমন একটি খাদ্যের রন্ধন প্রণালীর কথা—

''অনঙ্গ-বৌ নদীর ঘাটে জল তুলতে গিয়েছে। ভূষণ ঘোষের বৌ এক জায়গায় হাবড় কাদার ওপর ঝুঁকে পড়ে কি করছে।

অনঙ্গ বৌকে দেখে সে যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে গেল। যেন ওই অবস্থায় কারো সঙ্গে না দেখা হওয়াই ভালো ছিল, ভাবটা এমন।

অনঙ্গ-বৌ কৌতূহলের সঙ্গে বললে-কি হচ্ছে গে। গয়লাদিদি? ভূষণ ঘোষের বৌয়ের বয়স বেশি নয়, অনঙ্গ-বৌয়ের

সমবয়সী কিংবা দু-একবছরের বড় হতেও পারে। আঁচলে কি একটা ঢেকে সলজ্জ ভাবে বললে—কিছু না ভাই—

—কিছু না, তবে ওখানে কি হচ্ছে, তোমার মরণ?

—এমনি।

—তবুও?

—সুষনিশাক তুলছি—

বলেই হঠাৎ সলজ্জ হাসি হেসে আঁচল দেখিয়ে বললে—মিথ্যে কথা বলবো না বামুনের মেয়ের সামনে। এই দ্যাখো।

অনঙ্গ বৌ-বিস্ময়ের সঙ্গে বললে—ও কি হবে? হাঁস আছে বুঝি?

গয়লা-বৌয়ের আঁচলে একরাশ কাদামাখা গেঁড়ি-গুগলি, সে বললে—হাঁস নয় ভাই, আমরাই খাবো।

—ও কি করে খায়?

—এমনি। শাঁস বের করে ঝাল-চচ্চড়ি হবে।

—সত্যি!

—অনেকে খায়, তুমি জানোনা? আমরা শখ করে খাই ভাই ।

—কি করে রাঁধে আমাকে বলে দিয়ো তো?

— না ভাই, তুমি খেতে যাবে কি দুঃখে। তোমাকে বলে দেবো না।"[৪]

সেদিন গয়লা বৌ গেঁড়ি-গুগলির চচ্চড়ির পদ্ধতি আর বলেছিল কিনা আমরা জানি না। 'গেঁড়ি গুগলির চচ্চড়ি' যে কোনো রেসিপিকে হার মানিয়ে দিতে পারে। এই পদ্ধতিতে জানা যায়।- ভালোকরে গেঁড়ি গুগলির খোলা বা শক্ত আচ্ছাদনগুলি কোনো শক্তদণ্ড বা শিলনোড়ার আঘাতে ভেঙে শাসটা বের করে নেওয়া হয়। এরপর গেঁড়ির মুখের শক্ত আবারণগুলো কেটে বাদ দিতে হয়। গেঁড়ির শাঁসের সঙ্গে থাকা বাকি অংশগুলো কেটে ভাল করে জল দিয়ে ধুতে হবে। এরপর লবণ হলুদ মাখিয়ে উষ্ণ জলে সামান্য সিদ্ধ করে, সিদ্ধজল ফেলে দিয়ে, কড়াই-এ তেল দিয়ে গেঁড়িগুলো ভেজে নিতে হবে। এবার গরম তেলে পিঁয়াজ-আদা-রসুন দিয়ে ভেজে নিয়ে গুগলির শাঁসগুলো কড়াই-এ দিতে হবে। এর সঙ্গে হলুদ ও লঙ্কা দিতে হবে। এবং ভাল করে নেড়ে-চেড়ে কষে জল ঢেলে দিতে হবে। সঙ্গে অনুমান মতো লবণও দিতে হবে। গেঁড়িগুলিতে দেওয়া জল শুখিয়ে এনে তুলে পরিবেশন করা হয়।

রাঢ় অঞ্চলের হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলার বাউড়ি-বাগদীদের একটি উপাদেয় পদ। গেঁড়ি গুগলির চচ্চড়ি ছাড়া। 'পুনর্নবা' শাক অর্থাৎ শেপুণে শাক দিয়ে ডালনাও করা হয়। গোটা শামুক ভেঙে পরিস্কার করে কেবল শক্ত শাঁসকে শিলে ভালো করে থেঁতো করতে হবে। তারপর জলে ধুঁয়ে হলুদ মাখিয়ে তপ্ত কড়াই-এ গরম জলে সিদ্ধ করে নিতে হবে। পুনর্নবা শাক ভালো করে ধুয়ে সেগুলি সামান্য সরষে তেল দিয়ে-সামান্য জিরে দিয়ে ভেজে নিতে হবে। তার উপরে শামুকের শাঁস ও পুনর্নবা শাক দিয়ে জল ঢেলে দিতে হয়, সিদ্ধ হতে হতে জল কমে এলে তাতে চালের পিটুলি গুলে জল দিয়ে ফোটাতে হবে। সব উপদানগুলি লেই-এর আকার হয়ে গেলে তা তুলে রেখে ভাত বা রুটির সঙ্গে খাওয়া হয়। এই রন্ধন মূলত

আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র মাসেই করা হয়। কারণ জলাভূমিতে শামুক ও শাক সহজে পাওয়া যায়। পুনর্নবা শাক (Boerhavia repens) উঁচু ও পোড়ো ভূমিতে বেশি পাওয়া যায়। গরীব-দুঃখী মানুষের যখন বর্ষায় কাজ কর্ম থাকে না, ঘরে অন্ন জোটে না, তখন এই গেঁড়ি-গুগলিই হয় প্রাণ ধারণের খাদ্যবস্তু। আমরা শুনেছি বিয়াল্লিশের মন্বন্তরে মানুষ খাদ্যের আকালে বিকল্প হিসেবে জলাশয়-খাল-বিলের চুনোমাছ, গেঁড়ি-গুগলি, কচুঘেচু ওল-মান যা পেয়েছে তাই ভক্ষণ করে ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। তখন গোষ্ঠী নির্বিশেষে জাত-পাত নির্বিশেষে সকলেরই লক্ষ ছিল এমন সব কুখাদ্য। তখন ছোট জাতেরাই নয়, সব জাতের কাছেই ছিল সহজ পন্থা।

বাগদী বা বাউড়ি জনগোষ্ঠী গেঁড়ি-গুগলিকে নানা প্রক্রিয়ায় রন্ধন করেছে নিজেরাই নিজেদের মতো করে। 'চচ্চড়ি' কিংবা শাক-সবজি দিয়ে ডালনাই নয়, সুস্বাদু তেঁতুলের টকও রান্নায় পারদর্শী তারা। একই প্রক্রিয়ায় গেঁড়ি-গুগলি, শামুক রন্ধন যোগ্য করে তা তেঁতুলের গোলা জলে সাামান্য পরিমাণে সর্ষের ফোঁড়ন দিয়ে নুন হলুদ দিয়ে টক রান্না করে খান।

গেঁড়ি গুগলির সঙ্গে ডুমুরও খায় বাগদি ও বাউরি জনগোষ্ঠীর মানুষজন। দারিদ্রের তাড়নায় যখন কোথাও কিছু মেলে না, তখন প্রকৃতিই তাদের সহায়-সন্ধান হয়ে ওঠে। তখন বাদ থাকে না কিছুই —বনে-জঙ্গলে, জলাশয় মাঠে-ঘাটে যা পায় তাই হয় ভেজে নয় তো সেদ্ধ করে পেট ভরায়। যেমন সজিনা শাক সহজ উপায়ে পাওয়া যায় বলে সজনে শাক ভাজা খেয়েই অনেক পরিবার প্রাণে বেঁচে থাকার পথ অবলম্বন করে।

একটি জাতি কেবল অর্থনৈতিক কারণেই নয়, আর্থসমাজ ও বর্ণ ব্যবস্থার ফেরে জীবনযাত্রার মান নিম্নস্তরে পৌঁছালে মানুষ ভক্ষণ করতে পারে এমন সব খাদ্য বস্তু। আবার এইসব ভূমিপুত্ররা নিজেদের জীবন ও সাংস্কৃতিক বলয়ও গড়ে নিয়েছে নিজেদের জীবন যাত্রার অনুকুলে। খাদ্যা-খাদ্যের ব্যাপারে বাউড়ি কিংবা বাগদী শুধু নয় সংকটে সহবস্থান করে সব সম্প্রদায়ের মানুষ। যে জাতি বা বর্ণ গোষ্ঠী-খাদ্য-খ্যাদা বিচারে ম্লেচ্ছ-অস্পৃশ্যতার মাপকাঠিতে বিশ্বাসী ছিলেন তারা নিজেরাও নিজেদের স্বার্থে স্তর বদলে নিতে দ্বিধা করেননি। একসময় বলা হোত দলিতরা যেন মদ্যপায়ী একটি গোষ্ঠী, যাদের সংস্কৃতিতে মদ একটি অপরিহায্য বস্তু, কিন্তু পরবর্তীকালে মদ আর দলিত সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে থাকে নি। এখন কি ব্রাহ্মণ কি বৈশ্য কি ক্ষত্রিয় সবাই মদ্যপানে স্বচ্ছন্দ। বর্তমানে সব জাতি-সম্প্রদায়ই মদ্যপানে অভ্যস্থ। উচ্চ সংস্কৃতির স্মারক হয়ে উঠেছে মদ। এবং এই মদ্যপানের জন্য একটি গোষ্ঠীর ক্লাব কালচারও গড়ে উঠেছে।

সবেরই পিছনে অর্থনীতির চলাচল কাজ করে, বলাই বাহুল্য,—

''জাত ব্যবস্থার উচু-নিচু স্তরভেদ—কে কোন স্তরে আছে, আর্থিক অবস্থায় আর সামাজিক প্রতিপত্তির বিচারে কার স্থান কোথায়-তার একটা স্পষ্ট সূচক হয়ে উঠেছে...''[৫]

তেমনি আমাদের জীবনযাত্রায় খাদ্য-খাদ্যায় দলিত-অনুশোচিত জাতি সম্প্রদায়েও অর্থনৈতিক মানদণ্ডের হের-ফের না ঘোচায় জীবনযাত্রা একই স্তরে রয়ে গেছে। এখনো আদিবাসী অঞ্চলে লাল পিঁপড়ের ডিম, ইদুঁর, শজারুর মতো প্রাণী এবং কদমফুলের টক, মেটে আলু, জংলী ধুঁধুল, মহুয়াফুলের তরকারী বা ভাজা খেতে বাধ্য হচ্ছে মানুষ। বিভূতিভূষণ বহুকাল আগেই তাঁর 'হে অরণ্য কথা কও' গ্রন্থে লেখেন যে—

''বর্ষাকালে ছ'মাস গ্রামের লোক জংলী ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকে। 'এখানে বলে কান্দা'। নানারকমের কন্দও নাকি আছে। তাছাড়া জংলী আম, বেল ও কাঠ ডুমুর (Ficus cunia)। কাঠ ডুমুর এ অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র কোথাও নেই।''[৬]

আমরা একটি সমীক্ষায় প্রত্যক্ষ করি সামান্য অবস্থায় উন্নীত দলিত জনগোষ্ঠী কিভাবে একই খাদ্যদ্রব্যের রন্ধন প্রণালীতে পরিবর্তন এনেছে। যেমন শামুক-এর রান্নার পদ্ধতি বদলেছে এবং সুস্বাদু করার তাগিদে দ্রব্যাদি সংমিশ্রণের ব্যবস্থায় জানা যায়–

শামুকগুলির আচ্ছাদন ছাড়িয়ে মাংস তথা শাঁসগুলি বের করে নেওয়া হয়। শামুকের মুটি (শক্ত মুখের আবরণ) কেটে অন্যা অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলি ফেলে দেওয়া হয়। ভালো করে গরম জলে সামান্য সিদ্ধ করে একটি বাঁশের ফাঁকাপাবের মধ্যে শামুকের শাঁসগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে, পাবের মুখ ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সুসিদ্ধ হয়ে গেলে সেই বাঁশের পাবে শাঁসগুলি একটি গোলাকৃতি রূপপায়, যা বাঁশ ভেঙ্গে বা ফাটিয়ে বার করা হয়। গোলাকৃতি শাঁসকে ছুঁরি বা অন্য কোনো অস্ত্রের সাহায্যে চাকার ন্যায় খণ্ড বা টুকরো টুকরো করে নেওয়া হয়। এরপর একেবারে আধুনিক প্রক্রিয়ায় মাংসের মতো ঘি, তেল, পিঁয়াজ, রসুন, আদা, জিরে লংকাগুঁড়ো, হলুদ, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে কষে জল দিয়ে ফোটানো হয় এবং সময়মতো তা নামিয়ে ঠাণ্ডা হলে গরম মশলা মিশিয়ে ভাতের সঙ্গে কিংবা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করা হয়।

অতীতে কেবল লংকা হলুদ লবণ দিয়ে সিদ্ধই খেতো। অবস্থা ও রুচির পরিবর্তনে খাদ্যপ্রস্তুত করণেও এখন পরিবর্তন এসেছে এভাবেই।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ফোকটাই' নামের একটি রন্ধনের কথা জানা যায়- দরিদ্র রাজবংশী সম্প্রদায়ের রন্ধন প্রণালী থেকে। প্রথমে শুঁটকি মাছ পুড়িয়ে তাতে কলাগাছের এঁটের রস বের করে মেশানো হয়। সেই রসটি অগ্নিদগ্ধ অর্থাৎ পোড়া

শুঁকটি মাছটির সঙ্গে পোড়া লংকার মিশ্রণে একটি সুস্বাদু এবং সহজ পন্থায় খাদ্য দ্রব্যটি উপাদেয় হয়ে উঠে।

পৃথিবীতে সবারই বাঁচার অধিকার আছে, খেয়ে-দেয়ে বাঁচারও অধিকার আছে। মানুষ হিসেবে মানুষ বঞ্চিত সামান্য বাঁচার জন্যে। খাদ্যের ক্ষেত্রে বৈষম্য কেবল জাত-পাত বর্ণ বিভাজনের নিরিখে। এমন বৈষম্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের বিভূতিভূষণ—নিজে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির বাহক হয়েও, দরিদ্র দলিত মানুষদের মধ্যে উচ্চবর্ণীয়দের দৃষ্টিভঙ্গির হীনমন্যতাকে । 'আরণ্যক' গ্রন্থে তিনি তাঁর মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ নীতিতে সামান্য খাদ্যের জন্যে উপেক্ষার দিকটি বোধ করি এরূপেই প্রকাশ করেছেন—

''বৃষ্টির মধ্যে কোনও রকমে তো ব্রাহ্মণ ভোজন একরকম চুকিয়া গেল। বৈকালের দিকে দেখি ঘোর অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে অনেকক্ষণ হইতে তিনটি স্ত্রীলোক উঠোনে পাত পাতিয়া বসিয়া ভিজিয়া ঝুপসি হইতেছে - সঙ্গে দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েও। তাহাদের পাতে চীনার দানা আছে, কিন্তু দই বা ভেলি গুড় কেহ দিয়া যায় নাই, তাহারা হাঁ করিয়া কাছারি ঘরের দিকে চাহিয়া আছে, পাটোয়ারীকে ডাকিয়া বলিলাম—এদের কে দিচ্ছে? এরা বসে আছে কেন? আর এদের এই বৃষ্টির মধ্যে উঠোনে বসিয়েছেই বা কে? পাটোয়ারী বলিল- হুজুর, ওরা জাতে দোষাদ। ওদের ঘরের দাওয়ায় তুললে ঘরের সব জিনিসপত্র ফেলা যাবে, কোনও ব্রাহ্মণ, ছত্রী কি গাঙ্গোতা সে জিনিস খাবে না... ওই গরীব দোষাদদের মেয়ে কয়েকটির সামনে আমি গিয়া নিজে বৃষ্টিতে ভিজিয়া দাঁড়াইতে লোকজনেরা ব্যস্ত হইয়া তাহাদের পরিবেশন করিতে লাগিল। সামান্য চীনার দানা গুড় ও জলো টক দই এক-একজন যে পরিমাণে খাইল, চোখে না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করিবার কথা নহে। এই ভোজ খাইবার জন্য এত আগ্রহ দেখিয়া ঠিক করিলাম দোষাদদের এই মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিয়া একদিন খুব ভাল করিয়া সত্যকার সভ্য খাদ্য খাওয়াইব। সপ্তাহখানেক পরেই পাটোরীকে দিয়া দোষাদ পাড়ার মেয়ে কয়টি ও তাহাদের ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ করিলাম, সেদিন তাহারা যাহা খাইল-লুচি, মাছ, মাংস, ক্ষীর, দই, পায়েস, চাটনি—জীবনে কোনও দিন সেরকম ভোজ খাওয়ার কল্পনাও করে নাই। তাদের বিস্মিত ও আনন্দিত চোখ মুখের সে হাসি কতদিন আমার মনে ছিল।''[৭]

গরীব দলিত মানুষদের সম্ভ্রমদানে বিভূতিভূষণ ছিলেন যথেষ্ট উদার মানসিকতার ব্যক্তি। নিজের পারিপার্শ্বিক জীবনপ্রণালী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেই সেইসব জীবনের সত্যাসত্যকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন। নিজেই উপলব্ধি করেছেন এবং ঘুরে-ফিরে লেখার

মধ্যে দুলে-বাগদী, মুচি, কপালী, যুগীপাড়ার আর্থিক দুর্গতির সঙ্গে নিম্নমানের খাদ্য ও খাদ্যার কথাও উঠে এসেছে। বনে-জঙ্গলে কতরকমের শাক উচ্চবর্ণীয় ও উচ্চবিত্ত মানুষ সেই সব খাদ্য বস্তুর নামও রন্ধন প্রণালীও জানেন না- খাওয়া তো দূরঅস্ত। যেমন মণি ডাক্তার ছোট গল্পে দেখা যায়—

''ভাদ্রমাসে মণি ডাক্তার ডিপপেনসারিতে বসে আছে, দেখে যে একটি মেয়ে হাটতলায় বনের মধ্যে জামতলায় কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। কি খুঁজছে জানতে চাইলে সে বললে-ঘেঁটকোলের ডগা। –কি হবে ঘেঁটকোলের ডগা দিয়ে? মেয়েটি জানালে–ঘেঁটকোলের ডগা তো খায়– ছেঁচকি, চচ্চড়ি যেমন ইচ্ছা– কচুগাছের মত দেখতে, কিন্তু একটা পাতা তিনটে ভাঁজ করা। মেয়েটি ঘেঁটকোলের ছেঁচকি রাধবার প্রণালী শিখিয়ে, এক আঁটি ডগা তুলে দিয়ে গেল।''[৮]

বাংলার গ্রামীণ সমাজের এমন চিত্র পঞ্চাশ একশো বছর আগে একই ছিল। মানুষের খাদ্যাভ্যাস বদলেছে- এখন ব্রাহ্মণের আর ম্লেচ্ছের খাবার ভক্ষণে দোষ নেই - মুরগী পোড়া, ভাজায় মজেছে গলায় পৈতা নিয়ে। সেখানে বাদ-বিচার নেই, অথচ দলিতদের ছোঁয়া-ছুঁয়িতে, দলিতদের সংগঠিত ভাবে হত্যার ঘটনা আজও চলছে। বদলায়নি ভারতবর্ষ - ভারতবর্ষের জাতপাতের সংস্কৃতি। খাদ্য-খাদ্যা নিয়ে বৈরীতা শুধু নয়, মৃত্যুর মতো ঘটনাও আতঙ্কিত করে তোলে হিন্দু সংস্কৃতির নামে সব কাণ্ডকারখানা।-

''তথা কথিত প্রান্তিক নিম্নবর্গের মানুষদের বাঁচার জন্য যে ন্যূনতম ক্ষুদ-কুঁড়ো, মাড়ভাত, আমানি, ঘাসের বীজ প্রয়োজন,

তার অতি নিপুণ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি (বিভূতিভূষণ) তো এইসব প্রান্তজন–যাঁদের 'রাজার এঁটো' বা নোটোর দল বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁদের দৈনিক যাপনের খাদ্য, বাধ্যতামূলক উপোস, অনশনের পাশাপাশি বলে যেতে থাকেন অন্য এক ভারতবর্ষের ইতিহাস।''[৯] যে ইতিহাসের প্রবাহে থাকে দীন দরিদ্র দলিত মানুষের বাঁচা মরণের স্বপ্ন, যার উত্তরণ নেই। বিভূতিভূষণের আঁকা ভারতবর্ষই যেন সমানে চলছে– 'ভারতবর্ষ' 'ইন্ডিয়া' আর 'হিন্দুস্থান'—মেরা মহান হ্যায়, তিনরকমের ভারতবর্ষ শূদ্র জাগরণে নয়, দলিত নিধনেই এগিয়ে চলেছে।

পাদটীকা:

১. সুজিত ঘোষ, মশালচী, পাতাবাহার, পৃঃ ৯৭

২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরাজিত, মিত্র ও ঘোষ, দশম মুদ্রণ ১৩৮৩, পৃঃ ২৪

৩. দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, পুস্তক বিপণি, ২য় সংস্করণ, ২০১৩, পৃঃ ৭
৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশনিসংকেত, মিত্র ও ঘোষ, ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪১৯, পৃঃ ১১৩
৫. সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দলিত পুরাণের কথা, অনুষ্টুপ, ২০১৭, পৃঃ ১৬৫
৬. সুজিত ঘোষ, মশালচী, পাতাবাহার, পৃঃ ৬৬
৭. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরণ্যক, সম্পদনা, তাপস বসু, গ্রন্থবিকাশ ১৪১৯, পৃঃ ২৮-২৯
৮. সুজিত ঘোষ, মশালচী, পাতাবাহার, পৃঃ ১০৪
৯. কিন্নর রায়, খাদ্য, ক্ষুধা, জাতপাতের নিবিড় চিত্রমালার স্রষ্টা বিভূতিভূষণ, অশোক নগর, বিভূতিভূষণ সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা ১৪২১ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৮৪-৮৫

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বোধন’ নাটকে দুর্গা

টুম্পা রায় ব্যাপারী*

সারাংশ :

নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্রের ‘বোধন’ নাটকটি কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। নাটকের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র দুর্গা, সনাতনের স্ত্রী। তবে দাম্পত্য জীবনের মেয়াদ মাত্র ছ’মাস। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তার প্রেম-ভালোবাসা, প্রতিবাদী মানসিকতা, সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তার চমৎকার পরিচয় রেখে কিভাবে জীবনকে উৎসর্গ করেছে, তারই বিশেষত্ব তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে বর্তমান নিবন্ধে।

সূচক শব্দ : বোধন, দুর্গা, সীতা, সনাতন, দুলাল, কৃষক আন্দোলন।

মূল আলোচনা :

নাটকের ভূমিকাংশে উল্লেখ করা আছে ‘‘দিগিনবাবু যা দেখেছেন এবং নিজের জীবনে যে আঘাত পেয়েছেন তার থেকেই তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু উৎসারিত। সমাজের চারধারে যে অনাচার-অবিচার সুস্থ চেতনাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামী নাট্যকার তিনি। জীবন সমুদ্রের ওপর দিয়ে যে মন্থন চলছে তার বাঙ্ময় রূপকার একমাত্র তিনি।’’[১] তাঁর সেই সংগ্রামী মনোভাব নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে লক্ষ করা যায়। দিগিন্দ্রচন্দ্র সমাজের নীচু তথা দরিদ্র, শ্রমিক, চাষী মানুষের কষ্ট-দুঃখ-লাঞ্ছনাকে দরদ দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। নাটকেও তাই সেই সব শ্রেণির ভিড় লক্ষ করার মতো। ব্যক্তি জীবনে তিনি কখনো কারোর কাছে মাথা নত করেননি। কোন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেননি। আশ্চর্য যে, নাটকের চরিত্রেরও সেই আবেগ, সেই প্রতিবাদ স্পৃহা। কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা ‘বোধন’ নাটকটি। নাটকটির অন্যতম চরিত্র দুলাল, দুর্গা। তারা সেই আবেগ ও প্রতিবাদের দোসর।

মেয়েদের তিন রূপ কন্যা-জায়া-মা। দুর্গা চরিত্রটি নাটকে কন্যা ও জায়া রূপে প্রকাশ ঘটলেও ‘মা’ হতে পারেনি সে। মাত্র ষোল বছর বয়সে তার বিয়ে হয় ভাগচাষী দুলালের সঙ্গে। বিয়ের ছ’মাসের মধ্যে সে মারা যায়। বিবাহিত জীবনের সুখটুকু তারা মাত্র ছ’মাস উপভোগ করতে পেরেছে। কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা নাটকটি। তাই কৃষকের দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনা-অত্যাচার প্রভৃতি নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। ভাগচাষী দুলাল

*গবেষক ও প্রাবন্ধিক।

ও সনাতন। সারাটা দিন খেটে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল ফলায় তারা। অথচ সেই ফসল তাদের গোলায় ওঠে না। সে ফসলের উপর দাবি তাদের নেই। সমস্ত ফসল যায় মহাজনদের গোলায়। দুলালের মত চাষীরা পরিকল্পনা করে তারা তাদের ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ মহাজনকে দেবে। কিন্তু মহাজন তা মানতে রাজি নয়। তাই গায়ের জোরে জোতদারের সাহায্যে ফসল লুঠ করে নিজের গোলায় তোলে। জোতদারের হাত থেকে ফসল বাঁচাতে দুলাল, সনাতন সারারাত জেগে ফসল পাহারা দেয়। সনাতন যেন আগামী দিনগুলি চোখের সামনে দেখতে পায়। সে বুঝতে পারে তাদের গড়ে তোলা আন্দোলন একদিন সফল হবে। তাদের চাওয়া পাওয়া একদিন মিটে যাবে। সে দেখতে পায় কোন একটা দিন আসবে যেদিন জোতদারের দাপট থাকবে না। তাদের ফসল তারা ভোগ করতে পারবে। সনাতন বলে ওঠে, ''মশকরা না, মশকরা না পরখ করছিনু তোর সাহস। পারবি, পারবি, তোরাই পারবি , মোদের এখনো মাঝে মাঝে হাত কাঁপে- বুক দুর দুর করে।''[২] দুলাল জানে তার কাকা সনাতন একদিন স্বরাজ গরমেন্ট হবে বলে জোতদার পরিচালিত বিয়াল্লিশটি থানা পুড়িয়ে দারোগা মেরে একটা পেল্লায় কাণ্ড করে দিয়েছিল। কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি। যে নেশা নিয়ে তারা কোন বাঁধাই মানেননি, সেটা তাদের বিফল হয়েছে। প্রচণ্ড শক্তির কাছে তাদের সে শক্তি খুব বেশি রুখে দিতে পারেনি। তবে তারা হাল ছেড়ে দেয়নি। ইংরেজ আর জোতদাররা পরবর্তীকালে তাদের কি নিদারুণ যন্ত্রণায় কষ্ট দিয়েছে তা একমাত্র সনাতনরা জানে।

> সনাতন ।। বলিস কেনে দুলাল , গত সন চোরাবাজারে সাড়ে সাতশো মণ ধান বেচলো বেহারী জানা। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে না খেয়ে মরি। জমি চাষে আধি ভাগে পেলাম আঠারো মণ ধান- ধার শোধ করে বাড়ি নিয়ে এনু মাত্তর আট মণ। দুমণ ধান মাসে লাগে, ক মাস চলে! কণ্টোল দরে পাঁচ মণ ধান কিনতে চালাম, বেহারী জানা তা দেল তা !'[৩]

দুলালরা আর মেনে নিতে পারে না। গায়ের রক্ত জল করে যারা ধান ফলায় তারা ধান পাবে না এটা তারা সহ্য করতে পারে না। ফসল ফলানোর পর সারা বছর তাদের বাচ্চা কাচ্চারা উপোস করে থাকবে এটা হতে পারে না। দুলালরা সিদ্ধান্ত নেয় যদি জোতদাররা জুলুম করে তাহলে এক ভাগও তারা পাবে না। সনাতন এরমধ্যে খবর দেয় বেহারী জানা হরিপুর জোতের ধানটা নিজের গোলায় তুলে নিয়েছে। দুলাল বুঝতে পারে বর্গাদারেরা সাবধান ছিল না বলে এমন ঘটনা ঘটে গিয়েছে। তবে এ তল্লাটের চাষীরা এবার আর এমন অন্যায় হতে দেবে না। তবে চাষিদের এহেন আচরণ জোতদাররা দেখছিল। তারা নিজেদেরকে প্রস্তুত করছিল। পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা থানা গুলিতে আরো পুলিশ আনার কথা

বলে। তবে দুলালরাও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয়। তারা জানিয়ে দেয় চাষিরা সকলেই জেলে চলে যাবে। এতবড় জেল বানাতে গেলে গরমেন্ট হিমশিম খেয়ে যাবে। সনাতন জানায় সকলকে জেলে দেবে না। যারা নেতা শুধুমাত্র তাদের কেই জেলে ভরে দেবে। দুলাল উত্তর দেয় , ''নেতা ! মোদের কেউ নেতা নেই, কাকা , মোরাই মোদের নেতা। নেতা কি আর আকাশে ওড়ে , খিদের জ্বালায় লোক নেতা হয়ে ওঠে।''[৪] দুলালের কথায় সনাতন কাকা ভরসা করতে পারে না। তার বক্তব্য মাথাওয়ালা কতকগুলো লোককে তারা গারদে ঠেলবে। দুলাল এবার রেগে যায়।

> দুলাল ।। দুত্তোর কাকা, তোমার খালি ঐ এক কথা , মাথাওয়ালা, মাথাওয়ালা। মাথাওয়ালা নেতা তো অনেক দেখনু! চোরা কারবারীদের জন্য কি করে পারমিট জোগাড় করতে হয়, কি করে মদ গাঁজার দোকানের ভেণ্ডারী পাওয়া যায়, কি কল্লে মোটা মাইনের ছেলের সরকারী চাকরী জোটে, গরীবের দোহাই পেড়ে কি ভাবে নেতা হওয়া যায় , বলি, এসব বুদ্ধি কি তাদের মাথায় কম খেলে ? খালি বুদ্ধি থাকলেই হয় না, কাকা, বুদ্ধি থাকলেই হয় না, চাই দিল ... দিল চাই। (বুকে হাত দেয়) তা না হলে হয় অলসের বুদ্ধি।[৫]

সনাতনের মনে পড়ে যায় একদিন যে বেহারী জানা তাদের হয়ে বক্তৃতা দিত, আজ সে অন্য দলে মিশে গিয়েছে। সে এখন টাকার লোভে পড়েছে। টাকা ছাড়া তার কাছে আর কোন মানুষের দাম নেই। তাই সে সহজেই ভিড়ে যেতে পেরেছে জোতদারদের সঙ্গে। বিবেকটা সে বিসর্জন দিয়েছে। একদিন এই বেহারী জানা পুলিশ ডেকে এনে সনাতনের ঘর ভাঙার চেষ্টা করেছিল। তবুও সনাতন লোকটির ভুল দেখতে পারে না। সে জানায় বেহারী আগে এরকম ছিল না। দুলাল সনাতন কাকাকে বোঝাতে পারে না ও আগে যেমন ছিল এখনও তেমন আছে। টাকা দিয়ে দালাল জুটিয়েছে, পুলিশ পুষছে। গরিবের ধান সব নিয়ে যেতে তার এত টুকুও বাধে না। ওর সমস্ত ধান গোলা থেকে নামিয়ে গরিবের মধ্যে বিলিয়ে দেবে দুলালরা। লুঠ করার বিষয়ে সনাতন মত দিতে পারে না। তার মতে লুঠ করা অধর্ম্মের কাজ। দুলাল সনতনের এই কথা মেনে নিতে পারে না। বিহারী জানা পুলিশ দিয়ে যেদিন উমেশ প্রধানের গোলা থেকে জোর করে ধান নামিয়ে নিয়ে এসেছে , সেদিন সে কোন ধর্ম্মের কাজ করেছে ! সেদিন দুলাল চাঁদা তুলে দুমণ ধান দিয়ে এসেছে উমেশের বাড়ি তাতে তারা খেয়ে বেচে আছে এখন। হাজার হাজার মণ ধান ওঠে জোতদারের গোলায় তখন কেউ দেখতে পায় না। চাষিরা নিজের প্রাপ্যটুকু নিলে সেটাতে সবার চোখ টাটায়। জোতদারের গোলার ধান নিতে গেলে খুনোখুনি হয়ে যায় আর চাষির ধান নিতে

গেলে কেউ কোন কথা বলবে না। এটা আর হতে দেবে না। তারা কাকাকে দৃপ্ত কণ্ঠে জানিয়ে দেয়। এবার হবে জোর প্রতিরোধ, শুরু হবে লড়াই। চাষিরা আর কোন কিছু মুখ বুজে মেনে নেবে না। জোতদারের গাড়ি মাল বোঝাই করে ফসল নিয়ে যাওয়ার সময় দুলাল বাধা দেয়। জোতদাররা কোন বাঁধাই মানতে চায় না। তারা গুলি চালালে দুলালের হাতে গিয়ে লাগে। দুলাল বুঝতে পারেনি জোতদার বন্দুক নিয়ে আসবে। দুলাল ভুলে গিয়েছিল লড়াই করতে হলে শুধু গায়ের জোর নয়, অস্ত্রও দরকার হয়। দুলাল ভুললেও দুর্গা ভোলেনি তাই স্বামীর আঘাতের প্রতিশোধ নিতে সে বর্শা নিয়ে আক্রমণ করে। কিন্তু বন্দুকের গুলিতে তার মৃত্যু হয়।

দুর্গা চরিত্রের সাহসিকতা প্রসঙ্গে পুরাণের কথা বার বার উঠে এসেছে। সারারাত জেগে তার স্বামী ফসল পাহারা দেবে আর সে নিজে ঘরে আরাম করবে দুর্গা তা মেনে নিতে পারেনি । রাত-দুপুরে স্বামীর কাছে চলে এসেছে সে। দুলাল তাকে বন বাদাড়ের ভয় দেখালে সে বলে—

'কেনে তুমি অমন কথা কও, রামচন্দ্রের সনে কি সীতা বনে যায় নি?'

রামায়ণে আছে রামচন্দ্র পিতার আদেশ পালনের জন্য ১৪ বছর বনবাস নিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী সীতা রাজপ্রাসাদের সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য ছেড়ে তাঁর সঙ্গে বনবাসে গিয়েছিলেন। স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও কর্তব্যে সীতা স্ত্রী জাতির প্রতীক। দুর্গাও তার স্বামীর পাশে থাকার জন্য, তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য রাতে বাড়ি ছেড়েছে। তবে সে বুদ্ধিমতি, বাস্তব জ্ঞান সম্পন্না নারী। রাতে দুলালের কাছে আসার সময় জোতদারের সেবাদলের হাতে পড়তে পারে ভেবে কোমরে একটা বর্শার ফলক গুঁজে নিয়েছে।

দ্বিতীয়বার সনাতনের কথায় পূরাণ প্রসঙ্গ এসেছে। আহত দুলালের কষ্ট দেখে দুর্গা জোতদারের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে বন্দুকের গুলি দুর্গার বুকে লাগে। দুর্গা মারা যায়। স্বামীর অপমানে সে প্রাণ দিয়ে দেয়। পুরাণে কথিত আছে দক্ষরাজ সতীর সঙ্গে শিবের বিয়ে মেনে নেননি। শিবকে তিনি নিজের জামাই বলে মানেননি। দেখা যায় তাঁর আয়োজিত এক মহাযজ্ঞে তিনি সমস্ত জামাইকে আমন্ত্রণ করলেও দেবাদিদেব শিবকে আমন্ত্রণ করেননি। সতী তাঁর স্বামীর অপমানে সেখানেই দেহত্যাগ করেন। দুর্গার মৃত্যুও যেন সনাতনের কাছে সেই রকম মনে হয়—

''আহা রে! নামেও দুগগা কামেও দুগগা। সতী সতী, সতীর দেহত্যাগ হলো রে, দুলাল।''[৬]

রামায়ণের গল্পতে আমরা জানতে পারি সীতার হল কর্ষণে জন্ম। অর্থাৎ তিনি চাষীর ঘরের মেয়ে। রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল। আর তারই অপরাধে সমস্ত লঙ্কাপুরী

ধ্বংস হয়ে যায়। সীতা পবিত্রতার প্রতীক। পবিত্র সীতাকে রাক্ষসরাজ রাবণ ছুঁয়েছিল তাই তার এমন সর্বনাশ হয়েছিল। ভাগচাষী সনাতনের মুখে উচ্চারিত হয়—

''চাষীর মেয়ের গায়ে রাবণের বংশ নিপাত গেল, আর সেই চাষীর মেয়ের রক্তে আজ মাটি রাঙা হলো! সইবে না সইবে না, এতো অবিচার ভগবান সইবে না। এর বিচার একদিন হবে।''[৭]

রামায়ণের ভগবান স্বয়ং রামচন্দ্র। তিনি সীতাদেবীকে উদ্ধার করেছিলেন। সনাতনের বিশ্বাস ভগবান তাদেরও অসহায় অবস্থা দূর করবেন।

মহিষাসুরকে শাস্তি দিতে স্বর্গের দেবতারা দেবী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন। তিনি অসুরকে বিনাশ করে স্বর্গরাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। মহিষাসুরের ভিতরের অসুরকে মেরে দেবতা করেছিলেন তিনি। নাটকে দুর্গাও যেন মনে হয় ভাগচাষিদের আমন্ত্রণে এসেছে। তবে দেবী হয়ে নয়, ভাগচাষি দুলালের বউ হয়ে। অসুর রূপী জোতদারদের সঙ্গে সেও লড়াই করেছে । জিততে পারেনি কারণ সে দেবী নয় মানুষ। তবে লড়াইয়ের জোর, ইচ্ছাশক্তিকে আর সকল ভাগচাষিদের মনে সঞ্চারিত করেছে।

দুর্গার বাপের বাড়ির সকলের মধ্যে যে প্রতিবাদী মনোভাব ছিল তা জানা যায় সনাতনের মুখে। সংগ্রামে দুলালের পাশে দুর্গাকে দেখে সনাতন বলেছে—

''সাবাস, সাবাস মালের বিটি, বুকের পাটা আছে। আর হবে নি। তোর ঠাকুদ্দা নাকি সেপাইগো সাথে জোগ দিয়ে ইংরাজগো সঙ্গে নড়েছিল।''[৮]

সুতরং বলা যায় সমস্ত কাহিনি জুড়ে দুর্গার প্রতিবাদী সত্ত্বার প্রকাশ ঘটেছে। সে যে সাহসিনী এবং প্রতিবাদিনী তার তুলনা করতেই পুরাণ প্রসঙ্গ উঠে এসেছে নাট্যকাহিনিতে।

নাটকের শেষে দুলালের মুখে উচ্চারিত হয়েছে—

''দেখছো, দেখছো কাকা, ওর কপালের সিঁদুরের চাইতে ওর বুকের খুন কত বেশি রাঙা। রক্তজবার মতো রাঙা!... এখনো গরম... এট্টুও ঠাণ্ডা হয়নি।''[৯]

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটির মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা প্রাকাশ করেছেন প্রতিবাদী সত্তার মধ্য দিয়ে। স্বামীর প্রতি ভালোবাসাই তাকে প্রতিবাদী করে তুলেছে। দুলালের হাতে গুলি লাগা যে সহ্য করতে পারে নি, সে মানতে পারেনি তার স্বামীকে কেউ আহত করেছে। তারই প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে সে অসম অস্ত্রের লড়াইয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। আগামী দিনের লড়াইয়ে দুর্গা যেন অন্যদের কাছে প্রেরণা দিয়ে গেল। ন্যায্য অধিকার না পাওয়া পর্যন্ত লড়াই থামে না। দুর্গা যেন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার লড়াইয়ের মশালটা অন্যদের হাতে তুলে দিয়ে গেল।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায় দিগিন্দ্রচন্দ্র : একাঙ্ক বিচিত্রা, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১
২. তদেব, পৃষ্ঠা , ২
৩. তদেব, পৃষ্ঠা , ৩
৪. তদেব, পৃষ্ঠা , ৪
৫. তদেব, পৃষ্ঠা , ৪
৬. তদেব, পৃষ্ঠা , ৮
৭. তদেব, পৃষ্ঠা , ৯
৮. তদেব, পৃষ্ঠা , ৯
৯. তদেব, পৃষ্ঠা , ১১

পাটচাষ কেন্দ্রিক ভাষা ও সংস্কৃতির কথা : প্রেক্ষিত উত্তর ২৪ পরগণা জেলা

এ টি এম সাহাদাতুলা*

কৃষিকাজ মানুষের বহু প্রাচীন জীবিকা। শিকার ও আহরণ মুলক জীবিকার সীমা অতিক্রম করে কোন সুদূর অতীতে আমাদের পূর্ব পুরুষরা কৃষি সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছিল তা সঠিক করে বলা যায় না। সভ্যতার অগ্রগতির পথে বিশেষ এক মুহূর্তে কৃষিকাজকে আয়ত্ত করেছিল সেদিনের যাযাবর জীবন নির্ভর অরণ্যাচারী মানুষ। অতঃপর মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জুড়ে গিয়েছে কৃষিকাজ। আহরণমূলক ও শিকারধর্মী জীবিকার মধ্যে কমবেশি অনিশ্চয়তা ছিল। শিকার করতে গিয়ে প্রতিদিন যথাযথ শিকার পাওয়া ছিল অনেকটা ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু খাদ্যের প্রয়োজন তো আর কিছু দিয়ে মেটানো যায় না বা খাদ্য ছাড়াও কাটানো যায় না একটা দিন। ফলে সেদিন আমাদের প্রপিতামহদের আলাদা করে ভাবতেই হয়েছিল; আর তারই প্রেক্ষিতে উদ্ভব হয়েছিল কৃষিকাজের।

প্রাচীন কাল থেকে মানব সভ্যতার যে পথ চলা শুরু হয়েছিলো বিবর্তনের নানা স্তর অতিক্রম করে তা বর্তমানে মাল্টিমিডিয়ার যুগে উন্নীত হয়েছে। মানব সভ্যতার এই বিবর্তন কোনো সরলরৈখিক পথে অগ্রসর হয়নি। নানারকম ওঠা পড়া, ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে মানব সমাজ। মানুষের সামাজিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের পথে কৃষি সংস্কৃতিও বদলে গিয়েছে বারে বারে। তবে সে বদল অবশ্যই সৃষ্টির ধারায় সমান্তরাল পথে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষি সংস্কৃতির রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। একটা সময় কাঠের তৈরি লাঙল দিয়ে জমিতে চাষ দেওয়া হত। লোহা ও আগুন আবিষ্কারের পর কাঠের লাঙল অপ্রচলিত হয়ে যায়, তৈরি হয় লোহার ফালযুক্ত লাঙল। এই ভাবে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি, কৃষি পদ্ধতি, ফসল উৎপাদন সবকিছুতেই লেগেছে নতুনত্বের রং। পঞ্চাশ বছর পূর্বের পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্র আর বর্তমানের কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে দেখা যায় বিস্তর পার্থক্য। এই পার্থক্য একদিনের বিষয় নয়। এ হল চাষবাস নিয়ে মানুষের দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল। তবে কেবলমাত্র চাষবাস নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার কারণেই কৃষি সংস্কৃতিরতে বিবর্তন আসেনি। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ পরিস্থির পরিবর্তনও। এই প্রেক্ষাপটেই

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ (সান্ধ্য)।

আমরা তুলে ধরবো পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার পাট চাষ ও পাট সংস্কৃতির বিবর্তনের চালচিত্রকে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেরও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের বিশাল অংশ জুড়ে আছে কৃষিকাজ। সুদীর্ঘ কাল ধরে এরাজ্যের মানুষ কৃষিকাজকেই তাদের জীবন জীবিকার বিশেষ অবলম্বন হিসেবে বিবেচনা করে এসেছে এবং আজও তার ধারা সমানভাবে বিদ্যমান। জেলা হিসাবে উত্তর ২৪ পরগনার কৃষি-সংস্কৃতিও বহু পুরনো। বিশেষ কিছু ফসল যেমন ধান ও পাট উৎপাদনে এই জেলা রাজ্যের মধ্যে প্রথম সারিতে অবস্থান করছে বহুদিন। পাশাপাশি সবজি চাষে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। বহু বিচিত্র ধরনের সবজি এখানে উৎপাদিত হয়। বর্তমানে অত্যাধুনিক কৃষি পদ্ধতির প্রয়োগও এই জেলায় বেশি হচ্ছে। মোটকথা উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কৃষি সংস্কৃতি বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ কৃষি সংস্কৃতির একটি বিশেষ অধ্যায় হল পাট চাষ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলারপাট চাষের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। একটা সময় জেলার প্রায় অধিকাংশ জমিতেই পাট চাষ করা হত। পাটের সঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষের আত্মিক যোগ বর্তমান। এই সেদিন পর্যন্ত এখানে কৃষকরা মনে করতো এক বা দুই বিঘে জমিতে পাট চাষ করতে পারলে সারা বছর হেসে খেলে চলে যাবে। কথাটা আক্ষরিক অর্থেই সত্য ছিল। কুড়ি পঁচিশ বছর আগেও পাটের বাজার মূল্য ছিল যথেষ্ট। দুই বিঘা জমির পাট বিক্রি করে যে নগদ অর্থ পাওয়া যেত তা দিয়ে বছর ভর দৈনন্দিন খরচা চালিয়ে নিতে বিশেষ সমস্যা হত না। বর্তমানে পাটের বাজার দর রীতিমতো পড়তির দিকে। এতে চাষিরা ক্রমশ পাট চাষের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে। তবে তারপরেও অর্থকরী ফসল হিসেবে পাট যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছে। রয়েছে জেলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পাট-সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ প্রতিবিম্বন।

জেলায় পাট চাষ পদ্ধতি ও প্রসঙ্গ কথা

পাট চাষের সাধারণ রীতি অনুযায়ী উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতেও চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে জমিতে পাটের দানা বপন করা হয়। জমির উর্বরতা শক্তি, উচ্চতা, জলের পরিমাণ প্রভৃতির নিরিখে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়। জমির উর্বরতা ভালো হলে এবং জমিতে জলের যোগান যথাযথ থাকলে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে চাষের পত্তন দেওয়া হয়। অন্যথায় চৈত্র মাসের শেষে বা বৈশাখের শুরুতে প্রথম বৃষ্টি নামলে তবে জমিতে লাঙল নামানো হয়। পাট চাষের জন্য খুব ভালো করে লাঙল দিতে হয়। দুই বা তিনবার হাল চালিয়ে, তার উপর মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করা হয়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত পাটের জমিতে কমবেশি জৈব সার প্রয়োগ করা হত। এখন জৈব সারের প্রয়োগ প্রায় নেই; রসায়নিক সারেরই একছত্র আধিপত্য। জেলার কৃষকরা পাটবীজ নিজেরা তৈরি করেন না।

বাজার থেকে কিনে আনেন। গ্রামের মধ্যে কেউ কেউ অনেকক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বৃষ্টির পর জমি প্রস্তুত করে পাটবীজ বপনের তাড়া থাকে সকলেরই। প্রয়োজনীয় উপকরণ ও লোকবল সংগ্রহের জন্য তাই একটা যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। অন্যঅর্থে উৎসবের মেজাজ সৃষ্টি হয়। রোপনের পরে শুরু হয় পরিচর্যার পালা। যথাসময়ে বীজ থেকে চারা হয়। চারাগাছ বেশ একটু বড় হলে বিদে দেওয়া-র দরকার হয় অনেক সময়। বিদে দিতে হোক বা না হোক নিড়াতে কিন্তু হয়ই। প্রয়োজন মতো সময়ে সময়ে সার দেওয়া হয়। একটা সময়ে গাছ বড় হয়ে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন তা কর্তন করে জলে ভিজানোর ব্যবস্থা করতে হয়। সাত থেকে দশ দিন জলে ভিজান থাকার পর পাটকাঠি থেকে আঁশ ছাড়িয়ে নিয়ে শুকাতে দেওয়া হয়। অতঃপর সময় মতো তা বাজার জাত করা হয়।

পাট চাষ সংশ্লিষ্ট সমাজভাষা

ক) পদ্ধতি বিষয়ক

জো হওয়া

পাট চাষের জন্য জমিকে উত্তম পরিমাণে কর্ষণ করা আবশ্যক। মাটি খুব ভিজে বা শুকনো থাকলে এই কর্ষণ করা চলে না। না শুকোন, না ভিজে এমন অবস্থাতে জমিতে পাটচাষের জন্য লাঙল চালাতে হয়। জমির এই বিশেষ অবস্থাকে বলা হয় জো হওয়া।

মই দেওয়া

লাঙল চালানোর পর জমির উপরিভাগ অসমতল হয়ে পড়ে। এই অসমতল জমিকে সমতল করার জন্য মই দেওয়া হয়। লাঙল দেওয়ার সময় যেমন গরুর কাঁধে থাকা জোয়ালের সঙ্গে লাঙলের একাংশ সংযুক্ত থাকে মই দেওয়ার ক্ষেত্রেও তেমনি জোয়ালের সঙ্গে দড়ি দিয়ে একটা মইকে জুড়ে দেওয়া হয়। অতঃপর কৃষাণ ওই মই এর উপর উঠে দাঁড়ান। গরু চলতে থাকলে কৃষাণের শরীরের চাপে মই এর নিচের মাটি ক্রমশ মসৃণ হয়ে যায়।

বোনা

পাটের দানা সরাসরি ছড়ানো হয়। হাতের মুঠোয় দানা নিয়ে তা বিশেষ কায়দায় জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই কাজকে বলা হয় পাট বোনা।

বিদে দেওয়া

দানা ছড়ানোর পর চারা বার হলে কিছু দিন পর পাটের জমিতে বিদে টানতে হয়। জমির কোনো জায়গায় যদি চারার পরিমাণ খুব বেশি থাকে তবে তার কিছুটা তুলে ফেলতে হয়। তা না হলে পাটের বৃদ্ধি ভালো হয় না। যে বিশেষ পদ্ধতিতে পাটের চারা গাছ কিছুটা তুলে ফেলা হয় তাকে বলে বিদে দেওয়া। লোহার কতকগুলো শক্তকাঠি একটা কাঠের

সঙ্গে আটকানো থাকে। একে বলে বিদেকাঠি। জমিতে লাঙলের মতো করে বিদেকাঠি টানলে বিদের ফালে আটকে কিছু চারা উঠে আসে। এতে জমির পরিমাণ ও চারার মধ্যে সমতা রক্ষা হয়।

নিড়ানো

জমির আগাছা পরিষ্কার করাকে নিড়ানো বলা হয়। পাটের জমিতে নিড়ানোর ক্ষেত্রে নিড়ানি ব্যবহার করা হয় প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ পাটের চারা যখন ছোটো অবস্থায় থাকে। পরে গাছ বেশ বড় হয়ে গেলে নিড়ানি বা ওই জাতীয় কোনো যন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। হাত দিয়ে যতদূর সম্ভব আগাছা পরিষ্কার করা হয়।

পাট কাটা

পাট গাছের বৃদ্ধি যথাযথ হওয়ার পর তা বড় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়। পাট কাটার জন্য যে অস্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে 'হেঁসো' বলে।

বালি দেওয়া

হেঁসো অত্যন্ত ধারালো না হলে তা দিয়ে পাট কাটা যায় না। এমনিতে হেঁসো সারা বছর সেভাবে ব্যবহৃত হয় না। তাই পাঠকাটার আগে তাতে আলাগা করে ধার দিয়ে নিতে হয়। বালি সহযোগে হেঁসোয় ধার দেওয়া হয়। তাই ধার দেওয়া অর্থে সাধারণভাবে 'বালি দেওয়া' বলা হয়।

পাতা ঝাড়া

পাট গাছ কাটার পর তা জমিতে কয়েক দিন ফেলে রাখা হয়। এই সময় গাছের পাতা পচে যায়। পাট পচাতে দেওয়ার আগে ঝাড়া দিয়ে ওই পচা পাতা ঝরিয়ে ফেলতে হয়। এই কাজকে বলা হয় পাতা ঝাড়া।

বোজা করা

পাটগাছ পচাতে দেওয়ার জন্য কোনো জলাশয়ে নিয়ে যেতে হয়। আর এর জন্য কিছু পরিমাণ পাট গাছ একসঙ্গে বেঁধে এক একটা বাণ্ডিল করা হয়। এই বাণ্ডিলকে বলা হয় বোজা। প্রতি বোজায় এমন পরিমাণ পাট গাছ থাকে যাতে একজন মানুষ তা সহজে মাথায় করে বহন করতে পারেন।

জাগ দেওয়া

পাট গাছ থেকে পাটের আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়ার পথে এক বিশেষ পর্যায় হল জাগ দেওয়া। জলের নিচেয় বেশ কিছুদিন যাবৎ পাটের বোঝাগুলিকে ডুবিয়ে রাখা হয়। ডুবে থাকার বিষয়টি নিশ্চিৎ করার জন্য পাটের বোঝার উপর উপযুক্ত পরিমাণে কাদার বা অন্য কিছুর ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই সমস্ত বিষয়টাকে এককথায় বলা হয় জাগ দেওয়া।

জাগ ভেসে যাওয়া

জমির পাশাপাশি স্থির জলের জলাশয় না থাকলে কৃষকরা নদী বা খালে পাট জাগ দেয়। সেক্ষেত্রে জলের স্রোতে ভেসে যাওয়ার ভয়ে তারা দড়ি দিয়ে নদীর ধারের শক্তপোক্ত কিছুর সঙ্গে জাগটাকে বেঁধে রাখে। তবে তারপরেও অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে অনেক সময় নদী বা খালের জলের স্রোত বেড়ে গিয়ে দড়ির বাঁধন ছিড়ে যায়। এতে জলের স্রোতে ভেসে যায় পাটের জাগ। একেই জাগ ভেসে যাওয়া বলা হয়।

ভাসা জাগ ধরা

ভেসে যাওয়া জাগ কারও না কারও নজরে পড়ে। তিনি তখন সেটাকে ধরার চেষ্টা করেন। ভাসা জাগ ধরা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। জলের স্রোতের সঙ্গে রীতমতো লড়াই করে তবে ভাসা জাগকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়। যদি মালিক পক্ষের সন্ধান না পাওয়া যায় তবে যিনি ধরে রাখেন ভাসা জাগের মালিক তিনিই হন।

পাট ধোয়া

জাগ দেওয়ার কিছুদিন পর পাট পচে যায়। পচা পাটের গাছ থেকে পাটের আঁশ ও পাট কাঠি আলাদা করাকে বলা হয় পাট ধোয়া।

পেটা পাট

এটি পাট ধোয়ার একটি পদ্ধতি। এক্ষেত্রে এক বা দেড় ফুট লম্বা কাঠের টুকরো দিয়ে প্রথমে পচা পাটের গোড়ায় আঘাত করা হয়। তারপর পাটগাছের মাঝ বরাবর ভেঙে পাট কাঠির কিছুটা টেনে বার করা হয়। পরে অবশিষ্ট অংশ বার করে পাটের আঁশ আলাদা করা হয়। এই পদ্ধতিতে পাট ধুলে এর রং ভালো হয়, কিন্তু পাট কাঠি ভেঙে দুই টুকরো হয়ে যায়।

ছাড়ানো পাট

এই পদ্ধতিতে পচা পাটের গোড়া থেকে হাত দিয়ে পাটের আঁশ ছাড়িয়ে নিয়ে পরে টেনে টেনে পাট কাঠি বার করা হয়। এতে পাট কাঠি অখণ্ড থাকে। তবে এই পদ্ধতিতে ধুলে পাটের গুণগতমানে সামান্য ঘাটতি হয়। এতে এর বাজার মূল্য একটু কমে যায়।

নাচি

পাট ধোয়ার সময় সাধারণভাবে চারটে-ছটা করে গাছ একসঙ্গে ধোওয়া হয়; যাতে ওগুলিকে সহজে হাতের মুঠোয় ধারণ করা যায়। পরে ওই একমুঠো পরিমাণ আঁশকে একত্রে রাখা হয় এবং তাকে নাচি বলা হয়। এক একটি নাচি আলাদা আলাদা ভাবে শুকাতে দেওয়া হয়।

তড়পা

নাচির বৃহত্তর রূপ হল তড়পা। কয়েকটি নাচি একত্রিত করলে হয় তড়পা। সাধারণত

ভিজে পাট শুকিয়ে যাওয়ার পর তড়পা তৈরি করা হয় । তপড়াগুলি থরে থরে সাজিয়ে রেখে বাজারজাত করার আগে পর্যন্ত সহজে সংরক্ষণ করা যায়।

হ্যাঙা দেওয়া

প্রথমে পাটের আঁশের মতো পাটকাঠিও ভিজে থাকে। ভিজে পাঠকঠিকে বিশেষ পদ্ধতিতে শুকাতে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতির অন্যনাম হ্যাঙা দেওয়া। এক্ষেত্রে অনেকগুলো পাটকাঠি একসঙ্গে করে মাথার দিকে বাঁধা হয়। তারপর ঐ গোছা মাটিতে দাঁড় করিয়ে পাটকাঠির গোড়াগুলো একটু দূরে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে পাটকাঠিগুলো মাটিতে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে এবং অনেকটা পিরামিডের মত দেখতে হয়।

বওয়া

বহন করা-র সংক্ষিপ্ত ধ্বনিরূপ বওয়া। পাট চাষের ক্ষেত্রে বওয়া বহুলভাবে ব্যবহৃত শব্দ। কেননা নানাস্তরে বওয়া-র প্রশ্ন আসে। জাগ দিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাটের বোঝা বহন করতে হয়। তারপর ভিজে পাট ও পাটকাঠি বাড়িতে আনা সহ শুকনো পাট বাজারে নিয়ে যাওয়া সবই বওয়া বা বহন করা নির্ভর।

খ. উপজাত দ্রব্য বিষয়ক

পাকাটি

আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়ার পর পাটগাছের যে অবশিষ্ট অংশ থাকে তাই পাটকাটি বা পাকাটি। পাটকাঠি মুখ্যত জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে বেড়া দেওয়া বা অন্য অনেক কাজেও এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

গোড়ালে-আগালে

পাটকাঠির অংশ বিশেষ। পেটা পদ্ধতি পাট ধোওয়া হলে পাটকাঠি দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এর প্রথম ভাগ অর্থাৎ গাছের গোড়ার দিকের অপেক্ষাকৃত মোটা ও শক্ত অংশকে বলা হয় গোড়ালে। অন্য অংশ অর্থাৎ অগ্রভাগের সরু দুর্বল অংশকে বলা হয় আগালে। আগালের তুলনায় গোড়ালের বাজার মূল্য বেশি হয়।

পাটশাক

কচি পাট গাছের পাতা অনেকক্ষেত্রে শাক হিসাবে রান্না অথবা ভাজা করে করে খাওয়া হয়। খাওয়ার যোগ্য কচি পাটের পাতাই হল পাট শাক।

ছেলো

অনেক সময় সব পাটগাছের উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি হয় না।। কিছু গাছ অপেক্ষাকৃত সরু ও ছেটো হয়ে কিছুদিন পর শুকিয়ে যায়। এই রকম গাছ থেকে পাটের আঁশ ছাড়ানো যায় না। একে ছেলো বলা হয়। ছেলো মূলত জ্বালানির কাজে ছেলো ব্যবহৃত হয়।

গোঁজা

পাট গাছ কেটে নেওয়ার পর গাছের গোড়ার দিকে কিছুটা অংশ মাটির নিচেয় থেকে যায়। মাটির নিচেয় থাকা এই অংশকে বলা হয় গোঁজা। পরবর্তী চাষের জন্য জমিতে পুনরায় লাঙল দেওয়া হলে গোঁজা মাটির উপর উঠে আসে এবং তখন তা জ্বালানির জন্য সংগ্রহ করা হয়।

ফেসো

পাট গাছ থেকে আঁশ ছাড়িয়ে নেওয়ার পরও পাট কাঠির গায়ে সুক্ষ সুক্ষ তন্তু জড়িয়ে থাকে। ঐ সুক্ষ তন্তুগুলিকে ছাড়িয়ে এক জায়গায় করলে তাকে বলা হয় ফেসো। 'ন্যাতা' দেওয়ার কাজে ফেসোর বহুল ব্যবহার বর্তমান। ন্যাতা দেওয়া হল ঘর বা উঠোনের উপর কাদা মাটির প্রলেপ দেওয়া।

গ. ব্যবহৃত উপকরণ বিষয়ক

ধান বা অন্যান্য চাষে যেসব সাধারণ উপকরণ ব্যবহৃত হয় পাট চাষেও সেগুলি ব্যবহার করা হয়। তবে পাট চাষ করার জন্য কিছু অতিরিক্ত উপকরণ ব্যবহার করার দরকার পড়ে। এগুলি হল—

হেঁসো

এটি কাস্তের মত দেখতে কিন্তু কাস্তের থেকে অনেক বড় আকারের ধারালো অস্ত্র। এতে কাস্তের মত দাঁত থাকে না। হেঁসো পাট কাটার কাজে ব্যবহার করা হয়।

বিদে কাঠি

তিন বা চার ফুট লম্বা কাঠের পাটাতনে লোহার ফলা গেঁথে বিদে কাঠি তৈরি করা হয়। পাটের জমিতে অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলার কাজে বিদে কাঠির ব্যবহার বর্তমান।

বেড়ন

এটি পাট ধোয়ার একটি উপকরণ; পেটা পদ্ধতিতে পাঠ ধোওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বেড়ন হল এক ফুটের মতো লম্বা শক্ত কাঠ। বেড়ন দিয়ে পিটিয়ে পাটকাঠি আর আঁশ আলাদা করা হয়।

তাড়া

ভিজে পাট শুকনো করার জন্য তাড়াতে মেলে দেওয়া হয়। দুটো শক্ত বাঁশ মাটিতে লম্বালম্বি পুতে তার উপর আড়াআড়ি ভাবে একটি লম্বা বাঁশ বাঁধা হয়। ঐ আড়াআড়ি ভাবে বাঁধা বাঁশে পাট মেলে দেওয়া হয়। পাট মেলে দেওয়ার উপযোগী বাঁশের কাঠামোকে তাড়া বলা হয়।

ঘ) অন্যান্য

গাদা দেওয়া

ভিজে পাট শুকিয়ে যাওয়া মাত্র চাষিরা তা বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে যান না। কখনো কম সময়, কখনোবা দীর্ঘদিনের জন্য তা ঘরে সংরক্ষণ করা হয়। পাট ও পাটকাঠি সংরক্ষণ করা হয় যে পদ্ধতিতে তারই অন্যনাম গাদা দেওয়া।

ছটা

ছটা হল পাটকাঠি কেনাবেচার ক্ষেত্রে পরিমাপের একক। দুই হাত, আড়াই হাত, তিন হাত ইত্যাদি নানা মাপের দড়ি বা গাছের ছালকে ব্যবহার করা হয় ছটা হিসেবে।

উত্তর ২৪ পরগনা-র পাট-সংস্কৃতির সেকাল একাল

একদাপশ্চিমবঙ্গের সমাজ-অর্থনীতির ভরকেন্দ্র ছিল হুগলী শিল্পাঞ্চল। আর হুগলী নদীর উভয় তীরে গড়ে ওঠা শিল্পাঞ্চলের মূল শিল্পই ছিল পাট শিল্প। হুগলী নদীর দক্ষিণ তীর বরাবর ব্যারাকপুর, জগদ্দল, শ্যামনগর, নৈহাটি এলাকায় ছিল বহু চটকল। মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন-জীবিকার বিশেষ আশ্রয় ছিল এই চটকলগুলি। চটকলে শ্রমিকের কাজ থেকে শুরু করে কেরানীর কাজে যুক্ত ছিলেন অজস্র মানুষ। বাঙালি সংস্কৃতিতে চটকলের বাবু কথাটির প্রচলন হয়েছিল এইসূত্রেই।

হুগলী শিল্পাঞ্চলের চটকলগুলিতে কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছিল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। জেলার কৃষকরা পাটের মরশুমে অন্য কোনো চাষ করতেন না; শুধু পাটচাষে মনোনিবেশ করতেন। তখন পাটের বাজার ছিল যথেষ্ট ভালো। কৃষকরা পাট চাষ করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে পারতেন। পাশাপাশি গ্রামের অনেক মানুষ কৃষকদের থেকে পাট কিনে তা পাটকলে সরবরাহ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পাট চাষের উপর নির্ভরশীল ছিলেন এক বিশাল জনগোষ্ঠী। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

বর্তমানে হুগলী শিল্পাঞ্চল তার পূর্ব গৌরব হারিয়েছে। একের পর এক বন্ধ হয়েছে বিখ্যাত পাটকলগুলি। তখন গ্রাম থেকে ব্যারাকপুর অঞ্চলে এসে কাজ করতেন অগণিত মানুষ। তারা মেস করে থাকতেন। এতে গড়ে উঠেছিলো মেস সংস্কৃতি। এখন চটকলের শ্রমিকদের নিয়ে গড়ে ওঠা মেস বিশেষ দেখতেই পাওয়া যায় না। যে সমস্ত চটকল আজও চলছে তার শ্রমিকরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। আসলে চটকলের পূর্ব গৌরব না থাকায় এখন শ্রমিকের চাহিদা খুব কমে গিয়েছে। ফলে দূর দূরান্তের গ্রাম থেকে বিশেষ কেউ আর চটকলে কাজ করতে আসছেন না

যাইহোক, পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতেও উত্তর ২৪ পরগণা জেলার জনজীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে পাট ও পাটের বিভিন্ন অনুষঙ্গ। আমরা আগেই বলেছি, একদা এই জেলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষিকাজ। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে ছিল পাটের বহুমুখি ব্যবহার। গ্রামের হত দরিদ্র থেকে শুরু করে সম্পন্ন পরিবার সকলের বাড়িতে পাটকাঠি ছিল জ্বালানির প্রধান উপকরণ। এমনিতে গ্রামের মানুষের জ্বালানির অভাব বিশেষ ছিল না। চাষাবাদের উপজাত দ্রব্য, গাছের ডালপালা, এসব দিয়ে প্রয়োজনের বেশ কিছুটা মিটে যেত। সঙ্গে থাকত পাটকাঠি। তবে এসবই ছিল সাধারণ সময়ের জন্য। বর্ষাকালে কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হত। তখন জ্বালানির অভাব দেখ দিত। এই অভাব পূরণ করার ক্ষেত্রে পাটকাঠি ছিল প্রথম ও প্রধান সহায়ক। কৃষক পরিবার মাত্রতেই তাই কমবেশি পাটচাষ করা হত। অনেকক্ষেত্রে এমনও দেখা যেত, পাট বিক্রি করে অর্থ উপার্জন উপলক্ষ মাত্র , মূল লক্ষ জ্বালানি হিসেবে পাটকাঠি সংগ্রহ। বর্ষাকালে ব্যবহারের জন্য পাটকাঠি সংরক্ষণ করা হত বিশেষ করে। যে পদ্ধতিতে পাটকাঠি সংরক্ষণ করা হত তাকে বলা হয় গাদা দেওয়া। পাট কাঠির গাদা এমনভাবে দেওয়া হত যাতে তার মধ্যে জল প্রবেশ করতে না পারে। সবাই এই কাজ সঠিকভাবে করতে পারতেন না। যারা পারতেন তারা সমাদৃত হতেন। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন বাড়িতে বাড়িতে রান্নার গ্যাস ঢুকে পড়েছে। পাটকাঠির প্রয়োজনীয়তা কমেছে অনেকাংশে। এখন আর জ্বালানি কাঠের লক্ষ্যে পাঠ চাষ করা হয় না। পাটকাঠির গাদা-ও আর সেভাবে চোখে পড়ে না। একটা সময় ছিল যখন পাটকাঠির কেনাবেচা চলত আর পাঁচটা দ্রব্যের মতোই। তবে পাটকাঠি বেচা কেনার ব্যাপারে মেয়েদেরই ছিল অগ্রাধিকার। ছেলেরা এ নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা করতেন না।

এই সেদিন পর্যন্ত গ্রামে যাদের পাটচাষ করা বা পাটকাঠি কেনার সামর্থ্য থাকত না তারা পাটকাঠি নেওয়ার শর্তে বিনা পারিশ্রমিকে অন্যের পাট ধুয়ে দিতেন। একে বলা হত 'পাট ধুয়ে নেওয়া '। বিকল্প জ্বালানির ব্যবস্থা হওয়ায় পাট ধুয়ে নেওয়ার বিষয়টি আর সেভাবে প্রচলিত নেই। আগামী দিনে এর সম্পূর্ণ অবসান হবে হয়তো। একটা সময় পর্যন্ত জেলার বাচ্চাদের খেলাধূলার অন্যতম সামগ্রী ছিল পাটকাঠি। পাকাটির হ্যাঙার মধ্যে লুকিয়ে লুকোচুরি খেলা খেলতো বাচ্চারা। পাটকাঠি দিয়ে খেলাঘর তৈরি করা, লম্বা পাটকাঠি চিরে নানা রকম সমগ্রী তৈরি এসব ছিল জেলার বাচ্চাদের অতি পরিচিত ও ভালোবাসার বিষয়। খেলতে খেলতে ছোটোরা অনেক পাটকাঠি নষ্ট করতো ; বড়টা তাতে কোনো বাধা দিতেন না। তখন একদিকে যেমন পাটকাঠির প্রাচুর্য ছিল অন্যদিকে তেমনি পাটকাঠি নিয়ে বাচ্চাদের খেলাধূলা করার প্রতি সমাজ মানসের ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। এখন সবকিছুরই পরিবর্তন

হয়েছে। পাটকাঠি এখন আর অপর্যাপ্ত বিষয় নয়; পাটকাঠি নিয়ে খেলাধূলা করার ব্যাপারেও বাচ্চারা তেমন উৎসাহী নয়। তাদের সামনে রয়েছে অনেক বিকল্প খেলার সামগ্রী।

গ্রামীাণ গৃহস্থ জীবনে অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী হল দড়ি। সাংসারিক বিভিন্ন কাজে দড়ির দরকার হয় সবসময়। বাজারে নাইলনের দড়ি সহজলভ্য হওয়ার আগে পাটের দড়িই ছিলো মানুষের বিশেষ ভরসা। কৃষকরা সারাবছরের দড়ি পাকানোর জন্য বিক্রি করতে নিয়ে যাওয়ার আগে আলাদা করে কিছুপাট রেখে দিতেন। পাট থেকে দড়ি তৈরির একটি বিশেষ পদ্ধতি হল 'বেতে কাটা'। পরিবারের বয়স্ক পরুষরা সাধারণত এই কাজটি করতেন। মেয়েরা এই কাজ প্রায় করতেন না বললেই চলে। গ্রাম্য একটি কথা এইপ্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখ্য—উঠবি তো ছেলে ধরবি বসবি তো বেতে কাটবি। অর্থাৎ স্ত্রীর দাবি হল অবসর সময়ে তার স্বামী যদি পায়চারি করে তবে ছেলেকে সঙ্গে নিতে হবে; আর যদি পায়চারি না করে বসে বিশ্রাম নেয় তবে বেতে কাটতে হবে। ছেলেকে ধরার বিষয়টি আজও সমানভাবে সত্য, কিন্তু বেতে কাটার দৃশ্য দ্রুত অপসৃত হচ্ছে।

একটা সময় উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কৃষি সংস্কৃতির একটি পরিচিত বিষয় ছিলো ' গোঁজা কুড়ানো '। জ্বালানির প্রয়োজনে গ্রামের গরিব পরিবারের বাচ্চারা মাঠ থেকে গোঁজা কুড়িয়ে আনত। মালিকপক্ষ এমনিতে গোঁজার বিষয়ে তেমন আগ্রহ দেখাতেন না। গরিব বাড়ির বাচ্চাদেরই গোঁজার উপর বিশেষ অধিকার ছিল। গোঁজার মরশুমে ছেলে মেয়েরা দল বেঁধে মাঠে যেত এবং যত বেশি সম্ভব গোঁজা সংগ্রহ করতো। এক একটা পরিবার প্রচুর পরিমাণ গোঁজা কুড়িয়ে শুকনো করে তা সংরক্ষণ করতেন। সবচেয়ে দর্শনীয় বিষয় ছিল ছোটো ছোটো ছুড়িতে গোঁজা সাজিয়ে তা মাথায় নিয়ে বাড়িতে ফেরা। বিষয়টি আজ আর প্রায় দেখাই যায় না।

উত্তর ২৪ পরগণার পাট সংস্কৃতির আর একটি বিশেষ অনুষঙ্গ পাটের জাগ চুরি করা। যখন পাটের বাজার মূল্য খুব বেশি ছিল তখন চোরেরা অন্যের পাটের জাগ চুরি করে ধুয়ে নিত। একেবারে পচে যাওয়া জাগ চুরি হত বেশি। নদী বা খালে জাগ দেওয়া পাট চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকত । কারণ চোরেরা জলের স্রোতে ভাসিয়ে জাগ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে চলে পারত সহজে। চুরি যাওয়ার ভয়ে কৃষকরা বাড়ির কাছাকাছি পুকুরে বা স্থির জলে পাট জাগ দিত। এখন তেমন বাজার মূল্য না থাকায় পাট চোরেরা তাদের ব্যবসায় উৎসাহ হারিয়েছে।

নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের ধারায় মানিকের ‘পদ্মানদীর মাঝি’ ঃ প্রতি তুলনা

জ্যোৎস্না দত্ত*

বহতা নদী ও বহতা জীবন সমার্থ। নদী যেমন গুহা-গহ্বর থেকে জন্ম নিয়ে লোকালয়ের স্পর্শ নিতে নিতে সাগরমোহনায় পৌঁছয় জীবনও তেমনি নিজেকে প্রসারিত করতে করতে পৌঁছে যায় পূর্ণতার দুয়ারে। নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস না হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের ‘চন্দ্রশেখর’ উপন্যাসে প্রথম এই সত্যটি ধরা পড়েছিল, যে কারণে প্রমথনাথ বিশী তাঁর ‘বঙ্কিমসরণী’র আলোচনায় ‘চন্দ্রশেখর’কে ‘গঙ্গা প্রবাহিত কাহিনী’ বলেছিলেন। আর লেখক নিজে চঞ্চ ল জল ও চঞ্চ ল রমনী মনকে একার্থ ধরে নিয়ে লিখেছিলেন ঃ ‘জল চঞ্চ ল, ভুবন চাঞ্চ ল্য - বিধায়ীনীদিগের হৃদয়ও চঞ্চ ল..... জলে দাগ বসে না। যুবতীর হৃদয়ে বসে কি!” এই একইভাবে ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’ উপন্যাসে তারা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় হাঁসুলী বাঁকের নারীদের নদীর স্রোতের সঙ্গে তুলনা করেন। এই মেয়েরা কখনও গৃহলক্ষ্মী, কখনও সর্বনাশা কুলপ্লাবিনী। এইভাবে জল ও জীবনের সমান্তরাল তরঙ্গ বারে বারেই জীবন্ত হয়েছে বাংলা উপন্যাসের ধারায়; যার আরও কয়েকটি উজ্জ্বল নির্দশন রয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি’, অদ্বৈতমল্ল বর্মনের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’, সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ ইত্যাদি নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের মধ্যে।

১৯১০-এ প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ উপন্যাসে চিন্তাব্যাকুল দ্বন্দ্ব পীড়িত গোরার মনে গঙ্গার শান্ত সজল হাওয়া প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৯১৭-এ শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাস ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের ‘নৈশ অভিযানে’ নদীর ভয়ঙ্কর অন্ধকার রূপ যেমন আমরা দেখেছিলাম, তেমনি তার তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত ছিল জীবন ও মৃত্যুর দুই রূপ। ১৯৩৬-এ মানিকের ‘পদ্মনদীর মাঝি’ সম্পূর্ণ নদীকেন্দ্রিক আদল নিয়ে দেখা দিল। পরবর্তীকালে বাংলা আঞ্চ লিক উপন্যাসের ধারায় নদী যে বারে বারে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়ে দেখা দিয়েছে। তার সূচনা মানিকের ‘পদ্মনদীর মাঝি’তে। তবে লক্ষণীয় মানিক পদ্মার গল্প বলতে বসেন নি; মাঝির জীবন কাহিনী রূপায়নই তাঁর লক্ষ্য।

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা।

কিন্তু ইলিশের মরসুমে নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া মাঝিদের জীবনে সংগ্রামের কঠিন রূপ সেখানে আঁকা হয়েছিল। সেই সঙ্গে এই উপন্যাসে নদী থেকে সাগরে, শূন্যতা থেকে পূর্ণতায়, হারানো থেকে প্রাপ্তিতে পৌঁছানোর একটা সংকেত ছিল। হোসেন মিয়াঁর ময়নাদ্বীপ এখানে যে সাগরসংগমের গল্প বলে তা আসলে এক অন্য রকম জীবনকে পাওয়ার গল্প, যেখানে আছে অসাম্প্রদায়িক, সুস্থ, ব্যাধিমুক্ত জীবন ও যৌবনের আহ্বান। সেখানেও নারী ও নদী ছিল সমার্থক। কুবেরের স্ত্রী মালা সেখানে কূলেবাজ নদীর শান্ত, স্নেহময়ী রূপের প্রকাশ। আর কপিলা-মালার বোন — কুবের মাঝির প্রেমিকা। সে কূলনাশিনী নদীর প্রতীক। কুবের ও কপিলা এখানে একসঙ্গে ময়নাদ্বীপে যাত্রা করে।

মানিকের 'পদ্মনদীর মাঝি'তে দেখা যায় তাঁর 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র মতই জীবনচিত্রণের দুটি দিক। প্রথমটি হল পূর্ববঙ্গের পদ্মাতীর সংলগ্ন কেতুপুর গ্রামের মাঝিদের জীবিকা ও জীবনের রূপ ও সমস্যা, ভয়াবহ দারিদ্র্য, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুর্গতিময় জীবনযাত্রা মেলা-উৎসব-সকল বাস্তব জনপদচিত্র। এই জেলেপাড়ার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মের পার্থক্য থাকলেও তাদের দিনযাপনে কোনও পার্থক্য নেই, তারা সকলেই সমানভাবে ধর্মের চেয়ে যে বড় অধর্মটি পালন করে তা হল দারিদ্র্য। তাই তো শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসটির মূল্যায়ণে বলেছেন, ঃঃ "'পদ্মনদীর মাঝি' বোধহয় তাঁহার রচিত উপন্যাসাবলীর মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। ইহার একটা কারণ অবশ্য বিষয়ের অভিনবত্ব পদ্মানদীর মাঝিদের দুঃসাহসিক ও কতকটা অসাধারণ জীবনযাত্রার আকর্ষণী শক্তি। দ্বিতীয় কারণ, পূর্ববঙ্গের সরস ও কৃত্রিমতা-বর্জিত কথ্যভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ। কিন্তু উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে ইহার সম্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণী-অধ্যুষিত গ্রাম্যজীবনের চিত্রাঙ্কনের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব-প্রবৃত্তিগুরি ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমা নির্দেশ।....." (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'।)

আবার 'পদ্মনদীর মাঝি'র বাস্তবজীবনচিত্রণের অপর যে বিশেষ দিকটি উদ্ভাসিত সেটি হল কপিলার চরিত্র—কপিলা ও কুবেবের প্রেম। মালার বোন, কুবেরের শ্যালিকা, শ্যামদাসের স্ত্রী কপিলা পদ্মার মতই রহস্যময়ী, নিজের প্রাণবন্যায় উচ্ছল, দুকূলপ্লাবী, সেখানে কুবের আবেগ প্রবণহীন, কঠোর জীবন সংগ্রামের বাস্তবতায় কঠোরতম হৃদয়বৃত্তির অধিকারী। কুবের পঙ্গু স্ত্রী মালা বিচিত্র মাদকতাময় জীবনের স্বাদ কুবের মনে এনে দিতে পারিনি। যা কপিলা দিয়েছে। উপন্যাসে সেই রোমান্টিকতার বর্ণনা

আসে এইভাবে ঃ "আর কিছু চায় না কুবের কপিলার কাছে, গোপনে শুধু দুটা সুখ-দুঃখের কথা বলিবে। একটু রহস্য করিবে কপিলার সঙ্গে। বাঁশের ভঙ্গির মতো অবাধ্য ভঙ্গিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কপিলা টিট্‌কারী দিবে তাকে, ধরিয়া নোয়াইতে গেলে বসিয়া পড়িবে কাদায়, চাপা হাসিতে নির্জন নদীতীরে তুলিয়া দিবে রোমাঞ্চ ।" তাই তো চুরির দায়ে জেলে যাওয়ার বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য কুবের যখন হোসেন মিঁয়ার ময়নাদ্বীপে যাবে বলে নৌকায় উঠে বসে তখন সকল সমাজসংস্কার, পিছুটান বর্জন করে কপিলাও তার সঙ্গী হয়। তখন কুবেরও ভাবে ঃ "হ, কপিলা চলুক সঙ্গে । একা অতদূরে কুবের পাড়ি দিতে পারব না।" 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই যথার্থই বলেছেন ঃ "কপিলার আদিম অসংস্কৃত মনোবৃত্তির মধ্যে ছলনাময়ী নারীপ্রবৃত্তির সনাতন রহস্য বাসা বাঁধিয়াছে। সে দীর্ঘকাল কুবেরের সম্মুখে মোহজাল বিস্তার করিয়া ও ছদ্ম ঔদাসীন্যের অভিনয় করিয়া শেষ পর্যন্ত এক দুর্বোধ্য, অনিবার্য আকর্ষণে সেই ফাঁদে নিজেই জড়াইয়া পড়িয়াছে....."। এখানেই 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র কুসুমের সঙ্গে কপিলার তফাৎ চোখে পড়ার মত। কুসুম কিন্তু শশীকে মনে প্রাণে চাইলেও নারী ব্যক্তিত্বের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে কুসুমের প্রতি শশীর অবহেলা অনুধাবন করেছে এবং শশীর প্রতি তার গভীর ভালোবাসাকে অন্তর্জ্বালায় জ্বাজুল্যমান রেখে শশীর কাছ থেকে নিজে সরে এসেছে। নারীত্বের অপমান কুসুম হতে দেয়নি।

'পদ্মনদীর মাঝি'র মতোই বাংলা সাহিত্যে নদীকেন্দ্রীক অপর বিখ্যাত উপন্যাসটি হল তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', এটি ১৯৪৬ খ্রীঃ 'আনন্দবাজার' পূজাসংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৪৭ খ্রীঃ। "এই উপন্যাসের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তারাশংকরকে শরৎচন্দ্র পদক ও পুরস্কার' দানে সম্মানিত করেন।" (গ্রন্থপরিচয়, 'তারাশংকর রচনাবলী', সপ্তম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্স, চৈত্র ১৩৮০)। উপন্যাসটিতে 'হাঁসুলী বাঁক' আর 'কোপাই নদী'র যে বর্ণনা আছে, তা লেখকের বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রতিচ্ছবি, কল্পিত নয়। উপন্যাসের সূচনায় এই বাঁক ও নদীর যে অপূর্ব বর্ণনা আছে, সেটাই হল উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট। যা লেখক গভীর মমতায়, বাস্তবের নিরীক্ষে পরিবেশন করেছেন এইভাবে ঃ "কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম 'হাঁসুলী বাঁক'—অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত অল্প পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে। সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলী গহনার মত। .....কার্তিক-অগ্রহায়ন মাসে জল যখন পরিস্কার সাদা

হয়ে আসে— তখন মনে হয় রূপোর হাঁসুলী। এইজন্য বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক।"

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' গভীর সাংকেতিক তাৎপর্য বহন করেছে, এটি হয়ে উঠেছে একটি 'মহাকাব্যের সংঘাতধর্মী উপন্যাস'। এখানে কাহার সম্প্রদায়ের জীবন চিত্রিত হয়েছে, চিত্রিত হয়েছে গ্রাম ভিত্তিক সংস্কার-আচার ধর্ম-অন্ধবিশ্বাসে আবদ্ধ জীবনযাত্রার রূপ। সেই সঙ্গে কালের অনিবার্য গতিতে এসেছে পরিবর্তন, শিল্প ও গ্রামীন কৃষিভিত্তিক সমাজের লড়াই, শেষমেষ শিল্পসভ্যতার জয়। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় প্রাণপুরুষ বৃদ্ধ বনোয়ারী—সমাজের সংহত পরাক্রম, শাশ্বত নীতিবোধ, অপরিবর্তনীয় অন্ধ সংস্কারের সহযোগিতায় আপার অজেয় রূপে প্রতিভাত হলেও শিল্প সভ্যতার প্রতিভূ আধুনিকতার প্রতীক যুবক করালীর এককশক্তি, অমিত তেজ সমস্ত রক্ষণশীল জড়তার পতন ঘটিয়েছে এবং শেষপর্যন্ত অতীত ও নবীনের দ্বন্দ্বযুদ্ধে নবীনেরই জয় অবশ্যম্ভাবী হয়েছে প্রাণের স্পৃহা ও দুর্বার গতিধারায়।

'পদ্মনদীর মাঝি'র বছর দশকের মধ্যেই ১৯৪৭-এ প্রকাশিত হয়েছে। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'; নদী, সেখানে ভয়ঙ্কর সুন্দর। আষাঢ়ে সে অজগর সর্প, সে মা মনসার গলার হার। আর অগ্রহায়ণ পৌষে সেই একই নদী শান্ত সুন্দর। কখনো তার রজত গাত্র, কখনো তার গেরিমটি গোলা রঙ। 'নদীর ধারে বাস ভাবনা বার মাস'—এইভাবে নদী প্রবাহিত জীবনে নিরাপত্তার অভাব এখানে সূচিত হয়। আবার এই নদী যেখানে দুই ধারার মিলনে মেয়েদের হাঁসুলি গয়নার রূপ ধরে সেখানে সে হয় রোমান্টিকতার আশ্রয়। কোপাইয়ের ধারে হাঁসুলিবাঁকের বিচিত্ক জনজীবনের আলোচনাই এখানে ঔপন্যাসিকের মূল লক্ষ্য ছিল। এই কোপাই রবীন্দ্রনাথেরও প্রিয় নদী। এই অনার্য নদীকে বন্দনা করেছিলেন 'পুনশ্চে'র কবি। তারাশঙ্করের উপন্যাসটিকে নদী আসে সৃষ্টি ও ধবংসের বিপরীত রূপ নিয়ে। যার সঙ্গে উপমিত হয় হাঁসুলিবাঁকের নারীরা। কালোশশী এখানে দহের জলে ডুবে মরে। কালসর্পের বিষ সেই দহে ডোবা কালোশশীকে বিষে কালো করে দেয়। পুরাণের সমুদ্রমন্থনে যেমন বিষ ও অমৃত দুইই উঠেছিল এখানে বনওয়ারী ও কালোশশীর প্রেমের মন্থনে তেমনি করে উঠে আসে ভালোবাসার অমৃত আর মৃত্যুর বিষ। কখনো ময়ূরাক্ষীর পুল পেয়ে ঝমঝম করে চলে যায় নগর সভ্যতার রেলগাড়ী। আবার কখনো সুচাঁদের কল্পনায় জলে ভেসে আসে আলোকময় নৌকা 'বাবাঠাকুর'র আশীর্বাদ নিয়ে। উপন্যাসটির সূচনা 'শিসে' — 'হাঁসুলীবাঁকের ঘনজঙ্গলের মধ্যে রাত্রে কেউ শিস দিচ্ছে.....।' এ কিসের শিস? অবশেষে প্রমাণিত যে 'কত্তাবাবার থানে'র গাছে তার

বাহন বৃহৎ চন্দ্রবোড়ার শিস এটা। 'ডাকাবুকো' করালী বাঁশবনে আগুন দিয়ে তাকে দগ্ধ করেছে। বাবাঠাকুর কাহারদের রক্ষক, উপাস্য দেবতা। এই কর্ত্তার বাহন সাপটিকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে বনওয়ারী শাস্তি দিতে যায় করালীকে। কাহিনীবৃত্তে দেখা যায় বনওয়ারী ও করালী দ্বন্দ্ব নানাভাবে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত বনওয়ারীর পরাজয় নিশ্চিত হয়। করালী, নূতনকালের প্রতিনিধির হাতেই বাঁশবাদি সমাজের পালাবদল ঘটে।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা"র জীবনের বর্ণনায় দেখি কাহাররা বাবুদের বাড়ি কাজ করে, দরকার হলে পালকি বয়, বাবুদের বাড়ির অনুষ্ঠানে খাটে, পরে অবশিষ্ট অন্ন খায় ও বাড়ি নিয়ে আসে। কাহাররা ধনী চাষী ও বাবুদের ক্ষেতে কাজ করে, এবং হেঁদো মোড়লের মত ব্যক্তিদের পীড়ন ও প্রহারের ছবি উঠে আসে। এছাড়া উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপরা নানাভাবে কৃষক কাহারদের খাটিয়ে নিলেও ন্যায্য প্রাপ্য দেয় না। করালী এইসব অন্যায়-অত্যাচার-শোষণের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে, প্রতিবাদ করে। হেদো মণ্ডল যখন করালীকে 'বেটা' সম্বোধন করে কথা বলে, করালী তীব্র প্রতিবাদে গর্জন করে ওঠে....."উ কি? বেটা-বেটা বলছেন কেনে? ভদ্দলোকের উ কি কথা!" বনওয়ারী শঙ্কিত হয়, সমস্ত কাহারকুল হতভম্ব হয়ে যায় করালীর এই আচরণে। কাহার মেয়েপুরুষের শোষণের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ আর বনওয়ারীর মনে আশঙ্কা পালাবদলের। তাই তো যখন করালী বাবাঠাকুরের শিমূলগাছের ডালে চেপে চেঁচাচ্ছে—"হো—ঝড়—ঝড়—ব্যানোকাকা! পেলয় ঝড়! চাল থেকে নামো।" তখন বনওয়ারী ভেবে নেয় এবার করালীর নিশ্চয় সর্বনাশ হবে। কিন্তু হয় নি।

উপন্যাসটিতে কাহারদের বিচিত্র রীতি-নীতি করালী মানতে চায়নি। উচ্চবর্ণের পুরুষ কাহার মেয়েদের ভোগ করে, তারপর ফেলে দেয়, তাতে জাত যায় না। জাত যায় যদি কোনো কাহার মেয়ে দেহোপজীবিনী হয়। উপন্যাসে করালী সেই সত্যকে তুলে ধরেছে বনওয়ারীর সঙ্গে বাকযুদ্ধ ঃ "জাত আমার যায় নাই, আমি কারুর এঁটো খাই না। কাহারেরা সদ্‌গোপদের এঁটো কুড়িয়ে স্বগগে যায়।" বনওয়ারী অবশ্য মেয়েলোকের সতীত্বের মূল্যকে বিধির বিধান বলতে চেয়েছেন আর করালী এই 'বিধির বিধান'এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। যুদ্ধের হাত ধরে কাহার পাড়ার পরিবর্তন এসেছে। বনওয়ারীর চেনা দুনিয়া সম্পূর্ণ পাল্টে যাচ্ছে। উপন্যাসের ষষ্ঠ পর্বের শেষে কাহারদের সব বিশ্বাসের অবসান হয়েছে। বান এসেছে প্রবল; কোপাইয়ের দুকুল ভেসে গেছে; তবে প্রবল বন্যার আগেই বনওয়ারীর মৃত্যু হয়েছে। এই প্রবল বন্যা উপকথা নয়,

ইতিহাসের কথা। তাই তো উপকথার ছোট নদীটি ইতিহাসের বড় নদীতে মিশে গেল'।

উপন্যাসটির পরিণতি দেখি পুরনো কালের অবসান হয়েছে নূতনকালের আগমনে। উপন্যাসের শেষে কথক সুচাঁদবুড়ী আক্ষেপ করে বলেছে—"আঁঃ — হাঁসুসী বাঁকও শেষ, কথাও শেষ। আঃ—আঃ।" বলতে বলতেই থেমে যায় সুচাঁদ। "ভাবে শেষ কি হয়? কিছুর শেষ কি কখনো হয়েছে? চন্দ সূর্য্যি যতকাল, তার পরেও তো শেষ নাই। তার পরে আছেন মহাকাল।" বছর দুই পরে নসুবালার আগমনের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক নূতন সূর্যোদয়ের ইঙ্গিত দিয়ে উপন্যাসটির ইতি টানছেন। ঃ "করালী এসেছে। গাঁইতি চালাচ্ছে। বালি খুঁড়ছে। সে বলে —"মাটি খুঁড়ি। ঘর করব আবার। নতুন কাহারপাড়া হবে।" এখানে অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের সঙ্গে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র পার্থক্য উঠে আসে।

১৯৫৬ খ্রীঃ 'পুঁথিঘর' থেকে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি আত্মপ্রকাশ করে। তুলনার নিরিখে অত্যন্ত বিস্ময়কর ভাবে 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' ও 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র চোখে পড়ে। সেই মিল সাংকেতিক গভীরতর অন্তর্দৃষ্টির প্রেক্ষিতে। কোপাইয়ের তীরে 'হাঁসুলীবাঁকের সন্নিহিত অঞ্চলের কাহারদের জীবনের সঙ্গে হাঁসুলীবাঁকের ঘনিষ্ঠ যোগ, তাদের জীবনাচরণ, তাদের সংস্কার, বিশ্বাস, জীবনসংগ্রাম, কাহার সম্প্রদায়ের প্রাণস্পন্দন ও বেদনা তারাশঙ্করের উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। অন্যদিকে, 'তিতাস একটি নদীর নাম'এ মালো সম্প্রদায়ের জীবনসংগ্রাম, তাদের সংস্কার, বিশ্বাস, পূজা-পার্বণ, আশা-নৈরাশ্যের রূপ চিত্রিত হয়েছে। ফলে তারাশঙ্করের উপন্যাসের হাঁসুলীবাঁক যেমন কাহারদের জীবনপ্রতীক রূপে উদ্ভাসিত, তেমনি তিতাস হল মালোদের জীবনপ্রতীক রূপে চিত্রিত। হাঁসুলীবাঁক শুকিয়ে গেলে কাহারদের কৌম জীবন ছারখার হয়ে গেছে, বিপর্যস্ত হয়েছে সংস্কৃতির, বনওয়ারী ও করালীর মধ্য দিয়ে প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত অর্বাচীনের জয়ই ঘোষিত হয়েছে। সেই রকমই 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এও প্রদর্শিত হয়েছে সংস্কৃতির বিপর্যয়। তবে তারাশঙ্কর যেখানে ব্যক্তিবিশেষের মাধ্যমে সমষ্টিগত প্রেরণাকে চিত্রিত করেছেন, যা সাংকেতিকতায় তাৎপর্যমণ্ডিত হয়েছে। 'তিতাস'-এ লেখক কোন চরিত্রকেই কেন্দ্রীয় তাৎপর্য বিশিষ্ট করে তুলতে পারেননি। উপন্যাসটির প্রকৃত রসকেন্দ্র হল মালো সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত জীবনাবেগ। তাই অদ্বৈত মল্লবর্মণ ব্যক্তিবিশেষের পরিবর্তে সমষ্টিগত জীবনের চিত্রাঙ্কণেই অনেক বেশি সফল হয়েছেন।

'তিতাস একটি নদীর নাম' আসলে তিতাসের সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাসকারী মালো সম্প্রদায়ের জীবন পাঁচালী। মাঝি ও জেলেদের জীবন পাঁচালী। মালোরা কথায় কথায়

প্রবাদ- প্রবচন ব্যবহার করে, হাঁসুলীর কাহারদের মতই। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'তে প্রবীণ সংস্কৃতি আর নবীণ শিল্পসংস্কারের দ্বন্দ্বে যেমন নূতনের ধারক ও বাহক করালীর মাধ্যমে নবীন শিল্পসভ্যতার জয় ঘোষিত হয়েছে। অপর দিকে 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর উপন্যাসে প্রাচীন ও অর্বাচীন সংস্কৃতির দ্বন্দ্বকে দেখিয়েছেন এইভাবে — "তাদের ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ধীরে ধীরে লোপ পাইতে লাগিল।" লেখক বলছেন— "তাদের ছেলেরা হুকা ছাড়িয়া সিগারেট ধরিল। তারা আগের মত গুরুজনদের মানিত না। বাপু খুড়াদের প্রতি তাদের ভক্তি যেমন হ্রাস পাইল, তেমনি সহানুভূতিও কমিয়া গেল।"

এখানেও 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'র যুবা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি করালীর আচরণ, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির বেঁচে থাকা। এখানে প্রাচীনের প্রতিনিধি বনওয়ারীর সঙ্গে করালীর দ্বন্দ্ব ছিল ঠিকই; তা ছিল অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, সামন্ততন্ত্রের দাসত্ব থেকে মুক্তির বিরুদ্ধে; ব্যক্তি বনওয়ারীর প্রতি করালীর চরম শ্রদ্ধাই সেখানে প্রতিপালিত হয়েছে। তাই তো বনওয়ারীর মৃত্যুর পর ডাকাবুকো করালী— "সেই দাহের সময় সে এসে দাঁড়াল। নিয়ে এসেছিল পাকা শাল কাঠ আর ঘি। তাতেই চিতা সাজিয়ে বনওয়ারীকে চাপিয়ে তার পায়ের পরশ নিলে মাথায়। বললে—যাও, চলে যায় সগ্‌গে।" সেখানে "উপকথার ছোট নদীটি ইতিহাসের বড় নদীতে মিশে গেল।

কাহারপাড়া ও তিতাসের মালোপাড়া—দুই-ই শেষ হয়। কিন্তু হাঁসুলি বাঁকের লেখক দেখিয়েছিলেন ধবংসের মধ্যে সৃষ্টির আভাস তাই সেখানে করালী ফিরে ছিল নূতন বাঁশবনের পত্তন করার জন্য। কিন্তু তিতাসের লেখক উপন্যাসের শেষ করেন শুধুই শূন্যতার মাঝখানে—"সে মালোপাড়া আর নাই। শূন্য ভিটাগুলিতে গাছ-গাছড়া হইয়াছে। তাতে বাতাস লাগিয়া সোঁ সোঁ শব্দ হয়। এখানে পড়িয়া যারা মরিয়াছে, সেই শব্দে তারাই বুঝি বা নিঃশ্বাস ফেলে।"

আবার বাংলা সাহিত্যে এই নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির একটি সামাজিক মূল্য আছে। কারণ নদীকে ঘিরে চিত্রিত হয়েছে অন্ত্যজ জীবনধারা। যাদের জীবন জীবিকা সংস্কার, উৎসব সবই স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। পদ্মারধারে কেতুপুর গ্রামের জেলে সম্প্রদায়ের চিত্রায়ণ থাকে 'পদ্মানদীর মাঝি'তে। 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'র ময়ূরাক্ষ্মী ও কোপাইয়ের সংগমে অবস্থিত কাহারপল্লীর বিচিত্র জীবন উঠে আসে এখানে, যারা একই সঙ্গে পালকিবাহক ও কৃষিজীবী। 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এ আসে মালোপাড়ার কথা।

এরাও নদী ও মাছ নিয়ে জীবন কাটায়।

'পদ্মনদীর মাঝি'র মতই বিলাসের সমুদ্র সন্ধানের কাহিনী লেখেন 'গঙ্গা'র (১৯৫৭খ্রীঃ) লেখক সমরেশ বসু। তারাশঙ্কর কোপাই ও অদ্বৈতের তিতাস যদি কোথাও মিলে যায় ধবংসের ছবিতে তবে মানিকের পদ্মা ও সমরেশের গঙ্গা এই দুইয়ের মিলন ঘটে সমুদ্র যাত্রার মধ্যে। 'গঙ্গা' হল পশ্চিমবঙ্গের মাছমারাদের কাহিনী। অন্যান্য নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের মতই 'গঙ্গা'তে প্রেম ও প্রকৃতি একার্থক হয়ে যায়। এভাবেই বাংলার নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি জীবন ও মৃত্যুর সুতোয় বয়ন করে চলে অন্তহীন বিচিত্র মানুষের কথা।

বাংলা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির আঞ্চলিকতা বিচারে যে সকল বিষয় চোখে পড়ে—ভৌগোলিক প্রকৃতি-পরিবেশ, বৃত্তিজীবন আর ভাষা সংস্কৃতি। যেমন 'পদ্মনদীর মাঝি'তে মানিকবাবু নির্দিষ্ট ভূগোলকে প্রত্যক্ষ করে পদ্মাতীরবর্তী স্থানগুলির নাম উল্লেখ করেছেন;যথা কেতুপুর, সোনাখালি, দেবীগঞ্জ, চরডাঙা, আমিনবাড়ি, চাঁদপুর, গোয়ালন্দ, নোয়াখালি ইত্যাদি। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'তে তারাশঙ্কর কোপাইনদীর তীরবর্তী বাঁশবাদি গ্রাম, জাঙল গ্রাম, সাহেবডাঙা, থানা এলাকা, প্রভৃতি সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ীয়া অঞ্চলের বর্ণনা দিয়েছেন। 'গঙ্গা'তে সমরেশ বসু হাজির করেছেন পুরোখোঁড়গাছি, ধলতিতা, তেঁতুলিয়া, সারাপুর, বীরপুর, ইটিন্ডে, শাখচূড়া, টাকি, গোপালপুর, সন্দেশখালি, হাসনাবাদ, বসিরহাট, ব্যারাকপুর, বরানগর, নৈহাটী, জগদ্দল, ত্রিবেণী—বিস্তৃত দক্ষিণপূর্ব ও উত্তরপূর্ব অঞ্চলকে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' এসেছে গোকর্ণঘাট, শুকদেবপুর, চাঁদপুর, উজানিনগর, নয়ানপুর, বাসুদেবপুর, বৈকুণ্ঠপুর, তাতারকান্তি প্রভৃতি অঞ্চল।

ফলে বাংলা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের এই ভৌগোলিক প্রকৃতি পরিবেশ আর সেখানকার বৃত্তিজীবী মানুষের ভাষা-সংস্কৃতি বিশেষ মাত্রা বহন করেছে। এই সকল উপন্যাসের চরিত্রের সংলাপে এসেছে উপভাষা। সাধারণভাবে নদী অঞ্চলকে ভাটি-অঞ্চল হিসেবেই পরিচিতি দেওয়া হয়। আর যেখানে পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের নিম্ন-অববাহিকা অঞ্চল ভাটির দেশ নামে পরিচিত। সেহেতু নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের চরিত্রের সংলাপে দেখা গেছে রাঢ়ী ও বাঙ্গালী উপভাষার ব্যবহার। আর লেখক বর্ণনামূলক গদ্য হিসেবে সাধু ও চলিত রীতির ব্যবহার করেছেন। মানিকের 'পদ্মনদীর মাঝি' মূলতঃ হিন্দু জেলে মাঝিদের কাহিনী; তবে হোসেন মিঁয়া ও আমিনুদ্দির সংলাপে দু-চারটি মুসলমানি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মাঝি-মাল্লাদের ভাষাতে অনেক সময় শব্দ থাকে

না। সুরতরঙ্গ বা সুরধ্বনি অনুভূত হয়। যেমন ঃ 'যদু হে..... মাছ কি বা.....?" ('পদ্মনদীর মাঝি') 'পদ্মনদীর মাঝি'র ভাষা সম্পূর্ণ বঙ্গালী উপভাষার লক্ষণাক্রান্ত। যেমন — "ধনঞ্জয় বলে, সাঁজের দরটা জিগা দেখি কুবের। কুবের হাঁকিয়া দাম জিজ্ঞাসা করে। সন্ধ্যাবেলা আজ পৌণে পাঁচ, পাঁচ কিংবা সওয়া পাঁচ টাকা দরে মাছ বিক্রি হইয়াছে। শুনিয়া ধনঞ্জয় বলে, কাইল চাইরে নামবে? হালার মাছ ধইরা জুত নাই।" — বর্ণনামূলক এই গদ্য সংলাপে সাধুরীতির সঙ্গে পূর্ববঙ্গের (বঙ্গালী) উপভাষার এরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত উপন্যাসটিকে পূর্ণতা দিয়েছে।

আবার 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'তে তারাশঙ্কর রাঢ়ী উপভাষার ব্যবহার করেছেন। রাঢ়-অঞ্চলের কথ্য রীতি উপন্যসাটিকে বিশেষ শিল্প মর্যাদা দিয়েছে। যেমন 'তারপর কয়েকদিন শিস উঠেছিল আরও খানিকটা দূরে—ওই হাঁসুলী বাঁকের দিকে সরে। এখন শিশ্ উঠছে বাঁশবাদির বাঁশবনের মধ্যে কোনখান থেকে।"—এখানে পরোক্ষ সংলাপেও রাঢ় অঞ্চলের ভাষার প্রকাশ ঘটেছে।

তবে 'গঙ্গা' উপন্যাসে সমরেশ বসু কাব্যিক ভাষা প্রয়োগ করেছেন। 'গঙ্গা' হল শিকার কাহিনী।—জলের তলায় অদৃশ্য শিকার (মাছ) আর রোদ-বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করে জলের উপরে নৌকায় মাছ মারা। মানব সমাজের এই উত্থানের শক্তি পরিপূর্ণতা পেয়েছে গভীর কাব্যময়তায়। যেমন "পাঁচু দেখছে মাছ। হ্যাঁ, সুন্দর। বড় মাছটির কোমরের ওপরে একটু টিপন দিয়ে দেখল। হুঁ, ডিম আছে একটু। তা হলেও বেশ। সুন্দর গড়নটি আঁটোসাঁটো যুবতী মেয়ে মানুষটির মতো।"— উপমার ব্যবহারে অপূর্ব কাব্যময়তা প্রকাশ পেয়েছে। আর 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি সাধু ভাষায় লেখা, রোমান্টিক কাব্যময়তার প্রকাশ রয়েছে সেখানে, আর রয়েছে কুমিল্ল্যার আঞ্চলিক সংলাপ। যেমন—"কাদিরের পিপাসা হইয়াছিল। আঁজলা ভরিয়া তুলিয়া মুখে দিতে গিয়া দেখে অর্ধেক তার মাটি। বনমালী দেখিতে পাইয়া দয়ার্দ্র হইয়া উঠিল। 'থুইয়া দাও, খাইতে পারবা না। খালের জলে গাঙের জলেরে খাইছে। মালো পাড়ায় আমার কুটুম আছে। আলু তোলার পর নিয়া যামু তোমারে।'

কি কুটুম? সাদি-সম্বন্ধ করছ না কি?

'না। ভইন বিয়া দিছি।" লেখক প্রান্ত বর্গের মানুষ হয়েও সংলাপে ও বর্ণনাভঙ্গীতে ভাষাব্যবহারে এরূপ অপূর্ব কারুকার্য ঘটিয়েছেন উপন্যাসটির ছত্রে ছত্রে।

সুতরাং বাংলা নদীকেন্দ্রিক আলোচ্য চারটি উপন্যাসে অন্যতম যে দিকটি উঠে আসতে দেখি তা হল ঃ চারটি উপন্যাসই কোন না কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের

জীবনচিত্রের প্রতিচ্ছবি। মানিকের 'পদ্মানদীর মাঝি'তে কেতুপুর অঞ্চলের জেলে মাঝিদের জীবন-জীবিকা, উৎসব-অনুষ্ঠান, অভাব-অনটন-দারিদ্র্যের চিত্র; তারাশংকরের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'তে কাহার সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রাম, প্রাচীন সংস্কার বিশ্বাস—রীতিনীতি, উৎসব-আচার চিত্রিত; অদ্বৈত মল্ল বর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম'এ মালো সম্প্রদায়ের মহাকাব্য; সমরেশ বসুর 'গঙ্গা'তে মাছমারাদের জীবনসংগ্রাম বন্য পশুর মতো নির্মম; নদী সেখানে নিয়তি স্বরূপ। আলোচনার সুবিধার্থে একটি দিকে আলোকপাত করতেই হয় যে তারাশঙ্কর নিজে উচ্চ-ব্রাহ্মণ জমিদার, তাঁর মধ্যে রয়েছে সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে জমিদারী কৌলিন্য নেই কারণ তিনি মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী তাই ধর্মীয় ফিতে কেটে ফেলে শ্রমজীবী মানুষের কাছে আসতে পারেন। তিনি পুঁজিবাদী মানুষের প্রতিনিধি হোসেন মিঁয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারেন। সমরেশ বসু নিজে কায়স্থ, মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী, তাই 'গঙ্গা'তে রয়েছে পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, গঙ্গার মাছমারাদের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রাণের বন্ধন। তবে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটির লেখকই একমাত্র প্রান্তিক মানুষ যিনি প্রান্তজনের কথা বলছেন। এখানে অদ্বৈতবাবু তিতাসে উচ্চবর্ণের জীবন ব্যাখ্যার সঙ্গে নিম্নবর্ণের জীবনব্যাখ্যার সংঘাতকে চিত্ররূপ দিয়েছেন—যা পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলিতে অনুপস্থিত।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় বহু উপন্যাস ও ছোটগল্প তথা কাব্য চলচ্চিত্র রূপ পেয়েছে। তবে নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের ধারায় আলোচ্য 'পদ্মানদীর মাঝি', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', 'তিতাস একটি নদীর নাম' ও 'গঙ্গা'—চারটি উপন্যাসই উচ্চমানের চলচ্চিত্র রূপে আন্তর্জাতিক স্তরেও প্রশংসা অর্জন করেছে সু-অভিনয় আর দক্ষ পরিচালকের নির্মাণে। চারটি উপন্যাস চলচ্চিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে ঃ 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ১৯৬২তে, পরিচালক তপন সিন্‌হা; 'পদ্মনদীর মাঝি' ১৯৯৩-র ১৬ মে (ভারত-বাংলাদেশের যৌথ প্রয়াসে), পরিচালক গৌতম ঘোষ; 'তিতাস একটি নদীর নাম' ১৯৭৩ খ্রীঃ, পরিচালক ঋত্বিক ঘটক; আর 'গঙ্গা' ১৯৬৯ খ্রীঃ পরিচালক রাজেন তরফদার, এটি ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে নমিনেশন প্রাপ্ত দ্বিতীয় পূর্ণতর ছবি। এই ভাবে নদীকেন্দ্রিক জীবনের নানা চিত্ররূপ, জীবনসংগ্রাম, দারিদ্র্য-দৈন্যদশার রুক্ষ বাস্তবরূপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সংহতিদানের মাধ্যমে সার্বজনীন মানবিকতাবোধ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বাংলা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস এভাবেই হয়ে উঠেছে নদীর সঙ্গে বেঁচে থাকার এক বাস্তব শিল্পরূপ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'পদ্মনদীর মাঝি'।

২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'।

৩। অদ্বৈত মল্লবর্মণ ঃ 'তিতাস একটি নদীর নাম'।

৪। সমরেশ বসু ঃ 'গঙ্গা'।

৫। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

৬। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ 'চন্দ্রশেখর', 'কপালকুণ্ডলা'।

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'গোরা'।

৮। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'পুতুলনাচের ইতিকথা।'

৯। উজ্জ্বল মজুমদার (সম্পাদিত) ঃ 'তারাশঙ্কর ঃ দেশকাল সাহিত্য'

১০। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।'

বাংলার লোকসংস্কৃতি ও সমাজ ভাবনায় বোলানগানের রংপাঁচালী

দীপক মণ্ডল*

প্রবাহমানকাল ধরে বাংলার লোকগান বোলানগানের রং পাঁচালীর মাধ্যমে নিম্নবর্গীয় মানুষেরা সমাজের বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি গুলি রঙ্গব্যঙ্গ ও নানান মন্তব্যের মাধ্যমে জনমানসে সহজ সরল ও প্রাণজ্জ্বল ভাবে তুলে ধরে থাকে। যার মধ্যে মধ্যযুগীয় পাঁচালীর লৌকিক রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।[১] বাংলার বৈচিত্র্যময় সমাজ-সংস্কৃতি ভেসে ওঠে আঞ্চলিক সংস্কৃতির মধ্যে। মুর্শিদাবাদের লোকগান বোলানগানের রং পাঁচালী একটি আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে বহন করে চলেছে। নৃত্য ও সংগীতের মাধ্যমে গীতময় সংলাপ সহযোগে লৌকিক রূপদান পাঁচালীর আকার ধারন করত। প্রথমে লৌকিক দেবতাদের মাহাত্ম্য বিষয়ক আখ্যান গাওয়া হতো। মধ্য যুগে আখ্যান মূলক রচনাকে পাঁচালী বলা হতো। যেমন-সত্যপীরের পাঁচালী, লক্ষীর পাঁচালী, মাণিক পীরের পাঁচালী ইত্যাদি। কিন্তু বোলান গানের পাঁচালীতে বর্তমানে সমাজের বাস্তব দোষ ত্রুটি গুলি চিত্রিত করা হয়।[২]

প্রথমদিকে দেবতাদের আখ্যান মূলক রং পাঁচালী গাওয়ার সময় প্রথমে ঈশ্বরের নামে বন্দনা করা হত। তার পর মূল বিষয় বর্ণনা করা হতো এবং সবশেষে বোলানগানের রং পাঁচালী গাওয়া হতো। ধর্মীয় বিষয় নিয়ে গাওয়া রং পাঁচালীর উদাহরণ হলো- বেহুলা লক্ষীন্দর, সীতার বনবাস, রাজা হরিশচন্দ্র ইত্যাদি। বেহুলা লক্ষীন্দর নিয়ে গাওযা বোলান রং পাঁচালী[৩]।

‘‘ঘুমায়ো না আর বেহুলা জাইগা দেখোরে-
বাসর ঘরে কালনাগিনী পশিল কেমনে।’’

‘‘যাও যাও হংস তুমি বিধর্ব নগরে
গিয়ে আমার বারতা জানাও রানীরে।’’

উক্তো বোলান গানের রং পাঁচালী গুলি ছেলেরা মেয়ে সেজে অভিনয় করতো।

আধুনিককালে রং পাঁচালীতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক বাস্তব সমস্যা নিয়ে আলোচিত হয়। পাত্র-পাত্রীদের প্রেম, ডিভোর্স, ননোদ-বৌদির ঝগড়া, শ্বাশুড়ী-বৌমার দ্বন্দ্ব, সমাজ-রাজনীতি, সামাজিক জীবন যাপনের আচার ব্যবহার,

* অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বজবজ কলেজ।

স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রং পাঁচালী রচিত হয়।[৪] রং পাঁচালী অঞ্চল ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। একক ভাবে, দু জন বা তার অধিক চরিত্র মিলে গাইতে পারে। বর্তমানে মেয়েরাও রং পাঁচালীর পালা গানে অভিনয় করে থাকে। মুর্শিদাবাদের মালিহাটি, কাঁদরা, বদ্দিপুর প্রভৃতি স্থান এছাড়াও বর্ধমান, বীরভূম ও নদীয়া জেলাতে ও পাঁচালীর প্রচলন আছে।

শ্রোতাদের চাহিদা মতো কখনও আধ্যাত্মিক ধরনের, কখনও সামাজিক সংকট, সরস কৌতুক নিয়ে রং পাঁচালী গাওয়া হয়ে থাকে। এই পালাগানের লোক শিল্পীরা মূলত কিশোর বা যুবক ও যুবতীরা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, হারমোনিয়ান, ডুগি, তবলা, কাঁসর, ঘন্টা, খঞ্জনী ও আধুনিক বাদ্যযন্ত্র সহকারে আসরে গান গেয়ে থাকে। যেমন-

''কাম কাম পেয়ার লেডি
নেড়ে বডি চলে যেয়ো না।
আই এ্যাম ইওর হ্যাসব্যাণ্ড হবো
কাউকো বলো না।"

''পেয়ার করো পেয়ার করো ফেয়ার করো না
আই এ্যাম ইওর ওয়াইফ হবো কাউকে বলো না।

লোকশিল্পীরা নিজস্ব কথা ও সুরে গান গাইতে থাকে। যার মধ্যে লুকিয়ে থাকে বিশুদ্ধ হাস্যরস। এখানে যেমন প্রেমের বিষয় থাকে তেমনি আধ্যাত্মিক বিষয়ও থাকে। -রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়েও রং পাঁচালীতে গান গাওয়া হয়। ড. আশুতোষ ভট্টচার্যের মতে ''বাংলার লোক সংগীতে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম সংগীতের সংখ্যা নিরুপণ করা যায় না। রাধাকৃষ্ণ ব্যতীত পুরাণে আর কোন চরিত্র বাংলার প্রেম সংগীতে প্রবেশ করিতে পারে নাই।"[৬] রং পাঁচালীতে মানব জীবনের সুখ-দুঃখের নানান দিক ফুটে ওঠে। যা সমাজের গভীরে ব্যাপ্ত। সেকাল একালের মেয়েদের চালচলন, বধূ হত্যা, পরকীয়া প্রেম, পণ-প্রথা, বেশী বয়সে বিবাহ এবং কৌতুক নিয়ে রং পাঁচালী গাওয়া হয়। এমন কৌতুকের উদাহরণ হলো[৭]-

''জামাই ভাত খাউসি ভাত খাউসি ভালো তরকারি
কোদাল সেদ্ধ সাবল ভাজা নোড়া চচ্চড়ি।"

''কালকেকার ছিল দিদি বাসী আলুরদম
তা খেয়ে দিদি আমার হয় নি হজম।"

এছাড়াও বন্যা, খরা, ঝড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বেশ কিছু রাজনৈতিক ঘটনা যেমন পাঁচালীর মধ্যে গাওয়া হয়। তেমনি রং পাঁচালীতে সামাজিক প্রভাব সুদূর প্রসারী।

সামাজিক ক্ষেত্রে খাদ্যাভাব, বেকার সমস্যা, আধুনিক সমাজে বিবাহ সংকট ইত্যাদি ঘটনা আঞ্চলিক ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা হলেও এই বিষয় গুলি রং পাঁচালীর মাধ্যমে বহু জনীন আবেদন লাভ করেছে। মানবিক প্রেমের সুখদুঃখ নিয়ে গাওয়া পালা গানের কলি হলো।[৮]

''পীরিতের কেমন রীতি তুমি তা জান না
বন্ধু, তুমি জান না
সে ফিরে ধবলীর সনে
পেলাম গো বড় যন্ত্রণা''।

১৯৭৮ সালে বাংলায় যে বন্যার প্রকোপ দেখা দিয়েছিল তার কবলে কবলিত মুর্শিদাবাদের ভরতপুর অঞ্চলের মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনি বোলান গানের রং পাঁচালীতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন-

কলি-

''আঠারই ভাদ্র বন্যা হলো
ঘর বাড়ি সব ভেসে গেলো।
দিদিমণি টাকা পাঠালো
নেতারা সব খেয়ে ফেললো।''
''হে হারি কালে কালে ঘটালে কি কাকমারি
বন্যাতে দিলে হে ফেলে লক্ষ লক্ষ ঘর বাড়ি।[৯]
''একজন নয়, দুজন নয় বহুলোকে ঘর ছাড়া
মনের দুঃখে শুয়ে শুয়ে গুনছে আকাশের তারা''।
''হলোরে ভাই সর্বনাশ বন্যাতে দিলে পাছায় বাঁশ
চাষা ভূষি সব কুপোকাৎ হল যে পুরুষ নারী।''
''কট্রোলেতে দিচ্ছে চিনি, যৎসামান্য কেরোসিন
রাতে বেরোতে পাস হয়ে যায়, মাঠে চলে পাম্প মেশিন।
নাইকো বেতন পাকা বাড়ি, রাতে দিনে হিসেব করি
আবার কেজি প্রতি ১০০ মারি, পাকা বাড়ি হবে না।
হায়রে বর্তমানের সর্বস্থানের ঘটনা।''
''কোলে ছেলে পিঠে ছেলে, বলছে বাবা মা খাবো
আর কটা দিন থাম না গোপাল
আই আর এইট লাগাবো।''
''বিবি আমার বলছে দুঃখে পাটে দে তেল ঢাল মুখে

কাজ কি বল বেঁচে থেকে জুটে না গলায় দড়ি।"

''রিলিফ বাবু গ্রাম সেবক, বুকের উপর বসে
চাষী ভাইদের রিলিফ টুকু সব নিচ্ছে শুষে।"

গ্রাম্য জীবনে বন্যা কবলিত মানুষের নিদারুণ দুঃখ কষ্ট, সরকারি ত্রাণের আত্মস্বাদ করা ছাড়াও নানান সামাজিক সংকট, সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে।

''বড় লোকের ছেলে বলে
দিল্লী থেকে উড়ে এলে
মোদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল্লী ফিরে গেলে।"

যে সমস্ত বোলান গান রচয়িতা উক্তো গান গুলি রচনা করেছেন। তাদের নিয়ে রং পাঁচালী

''গৌরী শংকর নাম
পুরা ডাঙায় ধাম
রচনা করেছে এই বোলান গান।"

''দেবু সি মোদের দলপতি
আলু গ্রামে বসতি
ভরতপুর থানা মোদের
মুর্শিদাবাদ নিবাস।"

বাস্তবের রূঢ় মাটি খুঁড়ে নিমাই বিশ্বাস ভোট বেঁধেছেন ''ওরে ভাই রাজনীতি করলে দেশের কী ক্ষতি আজ ভাই, ভাই-এ নাই কোনও মিল, ঘুচল রে প্রাতি।[১০]

''বৌয়ে বৌয়ে নাইরে কথা, রোজ ঝগড়া ঝাটি
তাই তো বুঝি, এক বাড়িতে হল চার পার্টি।"[১১]

বোলান গানের রং পাঁচালী শুধুমাত্র প্রান্তিক মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না। লোক সংস্কৃতি, লোকশিক্ষা নিয়েও সচেতনা গড়ে তোলার চেষ্টা করে। যেমন-পালস্ পোলিও টীকা, মায়ের শিশু প্রতিপালন, স্বাক্ষরতার গুরুত্ব, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্ব ও আলোকপাত করে।

এই রং পাঁচালী সমাজের বাস্তব সমস্যাগুলি আলোকপাত করার চেষ্টা করলেও সমস্যা সমাধানের কোন দিশা দেখাতে পারে না। সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক অবক্ষয় গুলি তারা রোধ করতে পারে না। কিন্তু চিরন্তন সত্যগুলি মানুষের মনকে নাড়িয়ে দিতে পারে। ফলে কিছু মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে প্রতিবাদ

ও প্রতিরোধে মুখর হয়ে ওঠে। রং পাঁচালী যে সমাজে পরিপুষ্ট, সেই সমাজের চিত্র সে অবিকল, সহজ সরল ভাবে বর্ণনা করে চলেছে।[১২]

একবিংশ শতকে মুর্শিদাবাদ ও তার আশেপাশের অঞ্চলে বোলান গান ও রং পাঁচালী আজও মানুষকে আকৃষ্ট করে। এখানে শুধু বিনোদন নয়, সমাজে মননের প্রতিফলন ও ঘটে। রং পাঁচালীর এই সমাজ মনস্কতার জন্যই সে বিবর্তিত হয়েও টিকে থাকতে পেরেছে।

সূত্রনির্দেশ:

১. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য্য - বাংলার লোকসাহিত্য (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা, পৃ. ৬৭৪
২. শ্রী হর্ষ মল্লিক - বোলান কথা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১৭১
৩. সাক্ষাৎকার-শ্রী তপজ্যোতি কর - আলুগ্রাম, ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ, ২১.০৩.১৯
৪. বোলান রচয়িতা নিখিল পালের সৌজন্যে, মালিহাটী, ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ, ১১.০৩.১৯
৫. শ্রী হর্ষ মল্লিক - বোলান কথা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ.- ১৭৩
৬. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য্য - বাংলার লোকসাহিত্য (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা, পৃ. ৩৫৫
৭. সাক্ষাৎকার - দলপতি শ্রী দেবু সি - আলুগ্রাম, ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ, ২১.৩.১৯
৮. ক্ষেত্র গুপ্ত - ''গনসংযোগ এবং লোকসংস্কৃতি', লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৯৮, পৃ. ৪১
৯. শ্রী অসীম কুমার পাল - ইতিহাস অনুসন্ধান - ১৫, প্রবন্ধ, ফার্মা কে এল এম, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৬৯৭
১০. শ্রী নিমাই বিশ্বাস - বোলান রচয়িতা - আনন্দবাজার, কলকাতা, শুক্রবার, ২৯.০৩.১৯, পৃ. ৮
১১. তদেব
১২. শ্রী অসীম কুমার পাল - ইতিহাস অনুসন্ধান - ১৫, প্রবন্ধ, ফার্মা কে এল এম, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৭০৪

সাম্প্রতিক নদী বাঁধ সমস্যার একটি কল্পিত পূর্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ''মুক্তধারা''

দেবরাজ হাওলাদার*

প্রতিবছরই বর্ষা ঋতুতে ইছামতী নদীর পাশ্ববর্তী বনগাঁর দীনবন্ধু (উঃ ২৪ পরগনা) নগর সংলগ্ন অঞ্চল বৃষ্টির জলে প্লাবিত হয়। যার ফলে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় চাষ নির্ভর ধানক্ষেত এবং দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয় ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের বিদ্যালয় গুলির পঠন পাঠন। ইতিপূর্বে প্রতি বছর বর্ষা ঋতুতে দীনবন্ধু নগর যখন জলে প্লাবিত হত তখন সাধারণ মানুষের আশ্রয়ের একমাত্র স্থল ছিল দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষগুলি। দীর্ঘদিনের এই সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্য যন্ত্র নির্ভরতাকে কাজে লাগিয়ে দীনবন্ধু নগরকেন্দ্রিক ইছামতী নদীর পশ্চিম পাড়ে কয়েক মইল জুড়ে দীর্ঘ কংক্রিটের গাডওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। বৃষ্টি শুরু হলেই ইলেকট্রিক চালিত পাম্পের দ্বারা দীনবন্ধু নগরের জমা জল ইছামতী নদীতে ফেলে দেওয়া হয় ফলতঃ ইতিপূর্বে বর্ষার সময়ে যে ডুবন্ত অবস্থার তৈরী হত তা থেকে মুক্তি পায় দীনবন্ধু নগর। কিন্তু প্রশ্ন হল যে বিপুল পরিমানে অর্থব্যায়ে গাডওয়াল তৈরী করা হয়েছে তার দ্বারা ইছামতী নদীটিকে যদি পলিঢাকা অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়া হত কিংবা নদীটি সংস্কার করে এর প্রবাহকে নতুন ছন্দে বইয়ে দেওয়া হত তাহলে একদিকে জনজীবন যেমন মুক্তি পেত তেমনি নদীটিও রক্ষা পেত। হয়তো গাডওয়াল তৈরীতে যে অর্থব্যয় করা হয়েছে তার তুলনায় নদী সংস্কারে অনেক বেশি অর্থ ব্যয় হতো। কিন্তু নদী যেখানে মানব সভ্যতার রক্ষাদাত্রী স্বরূপ সেখানে এই অর্থব্যায়ের ঘটনা মানবতা বিরোধী হত না। তাছাড়া কংক্রিটের গাডওয়াল দেওয়ার পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে বর্তমানে নদীটি যেন একটি মজে যাওয়া জলাশয়ের আকার ধারণ করেছে। এই কারণেই ২০০৬ খ্রীঃ বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ে ''বিভূতিভূষণের পরিবেশ ভাবনা' বিষয়ে আলোচনা চক্রে যোগদান করার সময়ে উক্ত গাডওয়ালের বিরোধীতা করেছিলেন পরিবেশ ভাবুক রুশতী সেন ও জয়া মিত্র।

আসলে বাঁধ ২ ধরণের ১) আড় বাঁধ এবং ২) নদী সমান্তরাল বাঁধ। আড়াআড়ি বাঁধের তুলনায় আধুনিক মানবসভ্যতায় সমান্তরাল নদীবাঁধের পরিমান দিন দিন বেড়ে চলেছে। এ

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বামনপুকুর হুমায়ূণ কবীর মহাবিদ্যালয়।

সম্পর্কে বিড়লা কলেজের অধ্যাপক ড. শংকর কুণ্ডু লিখেছেন-

> ''বাঁধ মানে কি কেবল আড়াআড়ি নদী বাঁধ? না, তা নয়। নদীর দুপারে জলপ্রবাহের সমান্তরাল করে উঁচু পাথর, মটি, বা সিমেন্ট কংক্রিটের বাঁধানো অংশটিকেও বাঁধ বলি আমরা। সমতলভূমিতে, বিশেষ অতিবৃষ্টি বা বন্যার সময়, নদীর জল যাতে কূল ছাপিয়ে লোকালয়ে প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য এই লম্বালম্বি বাঁধের প্রয়োজন। বাংলার অধিকাংশ বাঁধ এই লম্বা বাঁধ, যা উত্তর হিমালয় পাদদেশে তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা নদীতেও আছে, আবার দক্ষিণে হুগলি, বিদ্যাধরা, রূপনারায়ণ, দামোদরও আছে। যত লোকসংখ্যা বেড়েছে, নদীর আবহবিকায় বসতি বেড়েছে মানুষের তত বাঁধের প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। গ্রামশহর বা চাষজিমি বাঁচাতে অতিরিক্ত জল নিয়ন্ত্রণে এই লম্বা বাঁধের ভূমিকা অপরিসীম।''[১]

আসলে লম্বালম্বি বাঁধ হোক বা আড় বাঁধই হোক না কেন নদীর গতিধারাকে আপনগতিতে প্রবাহিত হতে দেওয়াল যতটা মুক্ত মানবতার প্রকাশ ঘটে তার পরিবর্তে বাঁধ দিলে পুরুষতন্ত্রের জয় ঘোষিত হয়। এই পুরুষতন্ত্রের জয় ঘোষণার জন্যই আজ থেকে নয় দশক পূর্বে ১৯২২ খ্রী রচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ''মুক্তধারা'' নাটকে যন্ত্ররাজ বিভূতির মধ্যে দেখা গেছে জলপ্রবাহকে বদ্ধ করার উদ্দীপনা। এই উদ্দীপনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে যতটানা রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক প্রেক্ষিত ক্রিয়াশীল ছিল, তার চেয়ে অধিক পরিমানে ক্রিয়াশীল ছিল বিভূতর ব্যক্তিগত অহমিকা ও ঔদ্ধত্যের প্রকাশ। এই ঔদ্ধত্যের প্রমাণ মেলে নাটক ব্যবহৃত বিভূতির উক্তিতে, বিভূতি দূতকে বলেছে

> ''দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েছেন, আমাকে
> দিয়েছেন জলকে বাঁধবার শক্তি।''

বোঝা যায় বিভূতির মধ্যে ব্যক্তিগত শক্তি প্রদর্শনের অহংকার কতটা ক্রিয়াশীল ছিল। এই অংশে তাদের বলতে বিভূতি শিবতরাই অঞ্চলের প্রজাদের কথা বলেছেন। বিভূতি এই বাঁধ বাঁধার কাজে নিয়োজিত হয়েছে উত্তরকূটের রাজা রনজিতের আদেশে। রাজা রনজিৎ ''তাদের'' অর্থাৎ শিবতরাই এর সাধারণ প্রজাদের বশে আনার জন্যই বিভূতিকে দিয়ে মুক্তধারার জলপ্রবাহকে বেধে শিবতরাইএর প্রজাদের চরম বিপদ গ্রস্থ করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছেন। কারণ মুক্তধারায় বাঁধ দেওয়ার ফলে শিবতরাইএর প্রজাদের চাষের ক্ষেত যেমন নষ্ট হয়েছে, তেমনি তাদের প্রয়োজনীয় পানীয় জলের সংকুলান অবস্থা তৈরী হয়েছে। উল্লেখ্য নদী বাঁধ দেওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ বা উদ্দেশ্য ২টি যথা প্রথমত, বৈজ্ঞানিক উপায় চাষের জলের যোগান, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্যা নিয়ন্ত্রন। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক

দিক থেকে ব্যক্তি মানুষের ক্ষমতার দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের প্রকাশ করে নিজের গুরুত্বকে বুঝিয়ে দেওয়া। ''মুক্তধারা'' নাটকে মুক্তধারার বার্ণায় বাঁধ পড়েছে শেষোক্ত কারণে। কিন্তু যে উদ্দেশে বা কারণেই নদী বাঁধ গড়ে উঠুক না কেন, বাঁধের ফলে জনজীবন তথা সমাজজীবনে ভালো প্রভাব যতটা তার তুলনায়কুপ্রভাবই বেশি। কারণ যত প্রতিশ্রুতি দিয়েই বাঁধ নির্মাণ হোক না কেন ভারতবর্ষ তথা বর্হিভারতে বাঁধ গড়ে ওঠার পর সেই প্রতিশ্রুতি আংশিক পরিমানেও কার্যকর হতে দেখা যায়নি। বরং বাঁধ ভেঙে গিয়ে বন্যা, বাঁধ বাধতে গিয়ে প্রানহানি, কৃষকের ফসল নষ্ট হওয়া, বাঁধ গড়ে উঠতে গিয়ে সাধারণ জনসাধারণের পিতৃপুরুষের ভিটে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার ঘটনাই মোদ্যা কথা হয়ে দাড়িয়েছে। শুধু তাই নয় বড় বাঁধ মানবসমাজকে আরও কতভাবে ক্ষতি করে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিখ্যাত পরিবেশবিদ "onald Heyneman"

> The results are tragically evident ìì hundreds of more children with bilharizìibloated livers. In certain areas of Nigeria affected by the volta Dam. Thousands have been blinded by onchoceriasis– the river disease carried by black swollen limbs or gonads of older persons with— elephentiasis– the extreme manifestation of mosquito ìì borne failariasis. In the sudan– now players from Kalazar have reported– attacking the same wadihalfans– forced from their homes and resetited into areas endemic with this lethal disease. Mosquito borne malaria– the seourge of all the tropics. In some parts of Africa kills every other child before it reaches the age of three.
>
> Most directly the result of human activity– however is bilharzias– the morern plague of Egypt– its spread disease is to limited of Egypt but has spread throughout Africa and today affects 200 millions around the world– probably the fastest spreading and most pathogenic parasitic disease of man.২

উল্লেখ্য ''মুক্তধারা'' নাটকের রচনাকাল ১৯২২ খ্রীঃ সেইসময় বর্হিভারতে কিংবা ভারতবর্ষেও নদী বাঁধের কুফল অনুসন্ধান করা তো দূরের কথা নদীবাঁধই সেভাবে গড়ে ওঠেনি। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় বাঁধ সর্দার সরোবর বা নর্মদা বাঁধ। ১৯৬০৬১ সাল থেকে এই বাঁধ তৈরির জন্য আদিবাসী মানুষদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ ও জমি অধিগ্রহণের

কাজ শুরু হয়। এরই প্রতিবাদে তৈরী হয় ''নর্মদা বাঁচাও'' আন্দোলন। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন মেধা পাটকর। ১৯৮৬ খ্রীঃ মহারাষ্ট্রের জনগন তৈরী করেন ''নর্মদা ধ্বংসগ্রস্থ সমিতি''। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সকল ঘটনার বহুপূর্বে রচনা করেন 'মুক্তধারা' নাটকটি। কিন্তু আন্তরিক ভাবে ও প্রবৃত্তিগত ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করলে প্রকৃতিও তার প্রতিশোধ নেয়। এই চেতনা রবীন্দ্রনাথের জন্মগত চেতনা এবং সেই কারণেই 'মুক্তধারা' নাটকের নাট্যকাহিনীর সঙ্গে যেন কাকতালীয় ভাবেই বর্তমান বিশ্বের নদীবাঁধ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এমন কি আরও একধাপ এগিয়ে বলাযায়া যে, ''মুক্তধারা'' নাটকটি যেন, আজকের নদীবাঁধ বিরোধী আন্দোলনের পূর্বসূচনা হিসাবে একাধিক উক্তির ব্যবহার খুঁজে পাওয়া যায় ''মুক্তধারা'' নাটকে। এই কারণেই ড. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার লিখেছেন

> ''এই নাট্যকাহিনি সাম্প্রতিক নর্মদাবাঁধ সমস্যারই একটা কল্পিত পূর্বরূপ বলতে পারি। 'ধরনীর সঙ্গীত'এর সঙ্গে সৌষম্য রাখার জন্য পরিবেশবিদ পিতাপুত্র গেডেস রবীন্দ্রনাথের মনে তার নিজস্ব ধারণার যে সমর্থন জুগিয়েছিলেন, মুক্তধারা সম্ভবত তারই পরিণতি।''[৩]

উল্লেখ্য পরিবেশ রক্ষায়, স্কটিশ পরিবেশ বিজ্ঞানী প্যাট্রিক গেডেস (১৮৫৪১৯৩২) এবং রবীন্দ্রনাথের প্রচুর মিল রয়েছে। প্যাট্রিক গেডেস এবং পুত্র আর্থার গেডেস দু'জনেই ছিলেন জল, জলাশয়, বাঁধ প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। এই পিতাপুত্র বিজ্ঞানী মূলত জলদূষণ, বাঁধের ফলে জলের বদ্ধদশার বিরুদ্ধে একাধিক গবেষণা করেছেন। ১৯১৪১৫ খ্রীঃ নাগাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এই দুই পরিবেশ বিজ্ঞানীর সখ্যতা গড়ে ওঠে। কবি এই সম জাপান যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই জাপান যাত্রার বা জাপানের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায় ''সবুজপত্র'' পত্রিকার একাধিক প্রবন্ধে। কবির ''জাপান যাত্রীর পত্র'', ''জাপানের পত্র'' রচনা দুটি ও এরই নিদর্শন। বলে রাখা বালো শুধু নদীবাঁধ নয়, পুকুর ভরাট নীতির বিরুদ্ধেও রবীন্দ্রনাথের একাধিক অভিমত রয়েছে। এমন অভিমত রয়েছে প্যাট্রিক গেডেস ও আর্থার গেডেসেরও। আসলে একদিকে নদী বাঁধ ও পুকুর ভরাট এই দুটি প্রকৃতি বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জোর প্রচার চালিয়েছিলেন প্যাট্রিক গেডেস, আর্থর গেডেস এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যদিও পরিবেশ বিজ্ঞানী পিতাপুত্রের প্রেক্ষাপট ছিল বোম্বাই এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেক্ষাপট ছিল কলকাতা সংলগ্ন অঞ্চল। আসলে বোম্বাই সরকার এই সময়ে ম্যালেরিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পুকুর ভরাট নীতি গ্রহণ করেছিল। এই নীতি যেমন হঠকারী তেমনি বাস্তুতন্ত্রের ধ্বংসকারী। বোম্বাই শহরের পাশাপাশি কলকাতা

পৌরসভা ও পুকুর ভরটা, ছোট ডোবা ভরাট করে পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন করতে চেয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনাগুলি প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার পরিবর্তে যেমন হঠকারী ও সমূহ ফলপ্রদ হলেও ভবিষ্যতের জন্য ছিল চরম সর্বনাশের। সেই কারণেই বর্তমান সময়ে কিন্তু পুকুর ভরাট নীতির বিরুদ্ধে আইন তৈরী করেছে সরকার। বর্তমানে একবিংশ শতকে এসে পৌরসভা অঞ্চলে কোন পুকুর বা ডোবা ভরটা করতে গেলে তার জন্য পৌরদপ্তরের অুমোদন প্রয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই কালে বসেই কিন্তু পুকুর ভরাটে বিরোধিতা করেছিলেন, যদিও কবির সেই বিরোধিতা সাহিত্যিক ভাষায়-

> ''ওই পুকুরগুলেই ছিল আকাশের স্যাঙত, শহরের মধ্যে ওইখানটাতেই দ্যুলোক এই ভূলোক একটুখানি পা ফেলবার জায়হা পেত, ওইখানেই আকাশের আলোর আতিথ্য করার জন্য পৃথিবী আপন জলের আসনগুলো পেতে রেখেছিল।''[৪]

যাইহোক আমাদের আলোচ্য পুকুর ভরাট নয়নদীবাঁধ প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গত স্বদেশে এবং বিদেশে নদীবাঁধের ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আদিম জনজাতি। এই আদিম জনগণকে কখনো কখনো জোরপূর্বক বাঁধের কাজে লাগানো হয়েছে। যার ফলে তারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারিয়েছে এমনকি অনেকে আবার বাঁধ বাঁধতে গিয়ে তেমন কোন নিরাপত্তা পায়নি। অর্থাৎ বাঁধ বাঁধার কাজে গিয়ে আর ফিরে আসতে পারেনি কোথায় হারিয়ে গেছে— তার কোন প্রমাণও মেলেনি।

মুক্তধারা নাটকে অম্বা উত্তরকূটের সাধারণ মানুষের চোখে পাগলি। কিন্তু অম্বার পাগল হয়ে যাওয়ার কারণ হল তার পুত্র সুমন বাঁধ বাঁধতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। অর্থাৎ অম্বা সন্তান হারা হয়েছে বাঁধের কারনে, শুধু অম্বা নয় নাটকে বটুকের ২জন নাতিকেও আর ঘরে ফিরতে দেখা যায় নি। প্রত্যক্ষে এই তিন জনের হারিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ এলেও আলোচ্য নাটকে পরোক্ষে আরও অনেক মানুষের হারিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায়ের মানুষরাই বেশি পরিমানে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। তাইতো নাটক যন্ত্ররাজ বিভূতিকে বলতে শোনা গেছে-

> ''উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না তখন রাজার, আদেশে চন্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে আমারা আনিয়ে নিয়েছি। তারা তো অনেকেই ফেরেনি। সেখানকার যত মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হয়েছে।''

'মুক্তধারার বাঁধ নির্মান হয়েছিল দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে এর মধ্যে বহুবার সে বাঁধ ভেঙেছে। তাই কেউবা জলের স্রোতে ভেসে গেছে কেউ বা পাথর তুলতে গিয়ে চাপা পড়েছে।

নাটকে দূত বিভূতিকে বলেছিল-

> ‘এতকাল ধরে তুমি আমাদের মুক্তধারার ঝর্নাকে বাঁধ দিয়ে বাঁধতে লেগেছো। বার বার ভেঙে গেল, কতলোক ধূলোবালি চাপা পড়ল, কতলোক বন্যায় ভেসে গেল।’

প্রসঙ্গত এই সময়ে এভাবেই বহু মানুষ বিভিন্ন বাঁধ বাঁধতে গিয়ে মারা গেছে। ড. শম্পা মিত্র ‘‘মুক্তধারা মুক্ততন্ত্রের দিকে যাত্রা’ গ্রন্থে জানিয়েছেন —

> ‘‘১৯৩০ খ্রীঃ আগে আমেরিকায় প্রতি দশটার মধ্যে একটা বাঁধ ভেঙে যেত। ১৯৮৯ খ্রীঃ পেনসেলভানিয়ায় বাঁধ ভাঙা জলস্রোত ভেসে যায় ২,২০০ জন মানুষ। ১৯৬৭তে মানকসাগর গঠনগত ত্রুটির কারণে ভেঙে পড়ে ১০০ জন মারা যায়। ১৯৭৯ তে মাছুতে বাঁধ ভাঙলে মরে ২০০০ জন, ১৯৮১ তে গোপীনাথন বাঁধ ৪৭ জনের মৃত্যুর কারণ।’’

এই নাটকে বিভূতি দূতকে বলেছে—

> ‘বালিপাথর জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন চাষীর কোন ভুট্টার খেত মারা যাবে সে কথা ভাববার সময় ছিল না।’

বিভূতির এই বক্তব্যে স্বৈরাচারী দেশনায়কদের উদ্ধার্ত্য পূর্ণ কথার সুর শোনা যায়। শুধু তাই নয় গুয়েতা মালায় যে চিকসয় বাঁধ তৈরী করা হয়েছিল তার বিরোধীতা করলে ৪০০ জন আদিবাসীকে গুলি করে মারা হয়। প্রচলিত প্রবাদে পরিণত হয়েছে যে

> ‘‘আদিবাসী মানুষের রক্তে মাখা হয়েছিল ঠিকসময় বাঁধের মশলা।’’

ঠিক এমনি সুর শোনাগেছে মুক্তধারা নাটকে বটুর কণ্ঠে। বটু উত্তরকূটের নাগরিকদের বলেছে

> ‘বলি দেবে, নরবলি! আমার দুই জোয়ান নাতিকে জোর করে নিয়ে গেল আর তারা ফিরল না।’

মুক্ত প্রানের বার্তাবহী নায়ক অভিজিৎকেও বটু একথা বলেছে কিন্তু অভিজিৎ জানিয়েছে তার ঐ দুঃখ বেদী ভাঙার সময় এসে গেছে। আসলে যন্ত্র যতক্ষন প্রানের সহায় বা অনুকূল থাকে ততক্ষন তার টিকে থাকার অধিকার। কিন্তু যন্ত্র যখন প্রাণের প্রতিকূল হয়ে ওঠে তখনই প্রানের বিনিময়ে হলেও তাকে নির্মূল করার সময় এসে উপস্থিত হয়। তাইতো অভিজিৎ প্রানের বিনিময়ে মুক্তধারার ঝর্নাকে মুক্ত করে। শুধু অভিজিৎ নয় যে স্বৈরাচারী রাজার রনজিৎ বিভূতির দ্বারা দীর্ঘ প্রচেষ্টায় লৌহবাঁধ নির্মান করেছে। একসময়ে তার মুখেও শোনা গেছে-

'দেখেছ ওর পিছন থেকে সূর্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন? আর, ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মতো দেখাচ্ছে। অতটা বেশি উঁচু করে তোলা ভালো হয়নি।' উত্তকূটের পথিকের কাছে এই উঁচু বাঁধ 'অসুরের মাথার মতো।'

প্রসঙ্গত ১৯৯৯ খ্রীঃ নর্মদা বাঁধের উচ্চতা ৮০.৩ মি. থেকে বাড়িয়ে ৮৮ মি. করার অনুমতি দিয়েছিল সুপ্রীম কোর্ট। এই সময়ে ১১ই অগাস্ট মেধা পাঠকর বাঁধে উচ্চতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ১২ ঘন্টা জলে অবস্থান করে সত্যাগ্রহ অবস্থান করেছিলেন। কারন বাঁধে উচ্চতা যত বেশি হয় মানব সমাজে তার কুপ্রভাব তত বেশি পড়ে এরই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে প্রায় ১০০ বছর আগে রচিত হলেও রবীন্দ্রনাথের ''মুক্তধার'' নাটকে।

বর্তমানে জলাধার প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বাধ্য করা হয়েছ প্রকৃতির সঙ্গে মানানসই ভাবে জল ছাড়তে, যাতে জীবজন্তু ও উদ্ভিদের স্বাভাবিক জন্ম বলয় ঠিক থাকে। কিন্তু বাঁধের জল কখনই প্রাকৃতির নদীর স্রোতের সমতুল হতে পারেনা তাই পরিবেশবিদরা বাঁধ ভেঙে নদীর স্বাভাবিক গতি ফিরিয়ে দিতে বলছেন কিন্তু বাঁধ ভাঙার তেমন কোন নিদর্শন আজ পর্যন্ত তৈরী হয়নি। তবে আশার কথা হল আমেরিকায় জলসংস্থা BuRec 1993-তে Three Gorges থেকে প্রযুক্তিগত সহায়তা তুলে নিয়েছে, এই সংস্থার ড্যানিয়েল বেয়ার্ড বলেছেন, বাঁধ পরিকল্পনা সেকেলে এবং বড় বেশি ব্যায় সাপেক্ষ। তাদের সংগঠনের সাম্প্রতিক প্রাধান্যের জায়গা জলসম্পদ সংরক্ষন ও পরিবেশ সংরক্ষনে, বড় বাঁধ প্রকল্পে নয়।৫

উল্লেখপঞ্জী:

১। ড. শংকর কুণ্ডু নদীবাঁধ প্রযুক্তি ও মুক্তধারা নাটক রবীন্দ্র চিন্তার দু'একটি দিক। (রবি ঠাকুরের মুক্তধারা) সংকলন ও সম্পাদনা সৌমিত্র কুমার চ্যাটার্জী)। ১ম প্রকাশ, কলকাতা নাট্যকথা প্রকাশনা বিভাগ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, পৃ. ৮৭

২। Donal Heyneman The Canadian Jornal of Public Health– Vol-62– July-Aug– 1971– Page-303।

৩। উজ্জ্বল কুমারক মজুমদার ''বিশ্বভরা প্রান পরিবেশ ভাবুক ও রূপকার রবীন্দ্রনাথ।'' ১ম প্রকাশ। কলকাতা, এবং মুশায়েরা ২০০৭, পৃ. ২৩।

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান যাত্রী (রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড), ১ম প্রকাশ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৮৬৮, পৃ. ৫০৩।

৫। এই তথ্য পেয়েছি শম্পা মিত্র ''মুক্তধারা মুক্ততন্ত্রের দিকে যাত্রা''। ২য় সংস্করণ। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংবাদমহালয়া ২০১২, পৃ. ১১৮

সহায়ক গ্রন্থ:

১। মদনমোহন চোল ও সুধীর নাগ ''জনসংখ্যা ও পরিবেশ শিক্ষা''। ১ম প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ, এপ্রিল২০০৬।

২। পরমেশ চৌধুরী ''পরিবেশ বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ।'' ২য় সংস্করণ। কলকাতা, দে' বুকস্টোর, ভাদ্র১৩১৩।

৩। নেপাল মজুমদার ''রবীন্দ্রনাথ শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি প্রসঙ্গে।'' ১ম প্রকাশ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি২০০০।

৪। Patrick Geddes Wells and Tanks– Bombay Chronicle– 4th June– 1920.

নাট্যকার শম্ভু মিত্রের রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক অনুষঙ্গ

সন্তু মণ্ডল*

রবীন্দ্রনাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পূর্বে-ই তত্ত্বগত ভাবে রবীন্দ্রনাটক বিশ্লেষিত হতে থাকে, যার ফলে প্রচলিত 'ডিসকোর্স' তৈরী হয় যে, রবীন্দ্র-নাটক অভিনয়যোগ্য নয় । ধারাবাহিক সাফল্যের বিচারের মানদণ্ডে রবীন্দ্রনাটকের সফলতম পরিচালক শম্ভু মিত্র প্রথম নাট্যকার, যিনি দুঃসাহসিকতায় ভর করে অত্যন্ত সফলতার সাথে রবীন্দ্র-নাটকের মঞ্চায়ন ঘটান ও বিশ্বব্যাপী খ্যাতির অধিকারী হন । কোন্ যাদুতে তা সম্ভবপর হয়েছিল ? গণনাট্যের 'নবান্ন' নাটকের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার শম্ভু মিত্রের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটলেও সেই প্রতিভা পূর্ণরূপে বিকশিত হয় বহুরূপীর নাট্যকার শম্ভু মিত্রের সমগ্র নাট্যসৃষ্টির মধ্যে দিয়ে । ১৯৪৮ সালে 'অশোক মজুমদারের সম্প্রদায়' নামে বহুরূপীর পথচলা শুরু, রঙমহল নাট্যশালায় পরপর তিনরাত্রি নবনাট্যের 'নবান্ন' নাটকের প্রযোজনা তেমন ভাবে নবত্বের সফলতা না পেলেও শুভ সূচনা হয়েছিল এক অন্য নাট্য-ইতিহাসের । ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত শম্ভু মিত্র প্রযোজিত পূর্ণাঙ্গ নাটকের সংখ্যা ২০ টি ও একাঙ্ক নাটক ৩ টি। এর মধ্যে রূপান্তরিত নাটকের সংখ্যা ৪ টি । অবশিষ্ট ১৬ টি পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে ৫ টি রবীন্দ্রনাটক। আসলে নাটককার রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি নাট্যকার শম্ভু মিত্র প্রয়োগকৌশলে সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক চেতনার অনুষঙ্গ বহমান ছিল, যার ফলে তা কালোত্তীর্ণ হয়েছিল।

''রক্তকরবী' বা 'চার অধ্যায়'-এর থেকেও ভাল রাজনৈতিক থিয়েটার বাংলায় হয়েছে বলে তো আমার মনে হয় না।"[১]

১৯৩৭ এ সারা বিশ্বের যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁকে 'বরণীয়েষু' বলে সম্বোধন করে প্রগতি লেখক সংঘ প্রকাশ করেছিল 'প্রগতি' নামে এক সংকলন। ১৯৩৮ সালের ২৪ ও ২৫ শে ডিসেম্বর আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে সারাভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সৌভাগ্যের ও আনন্দের তাৎপর্যময় বিষয় ছিল এই যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং এই সম্মেলনের উদ্বোধক হতে মনস্থির করেছিলেন । অবশ্য শেষ পর্যন্ত শারীরিক অসুস্থতার কারণে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আসতে পারেননি। তাই তিনি এই কনফারেন্সের উদ্দেশ্যে লিখিত ভাষণ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং সম্মেলনে তা

*গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

পড়া হয়েছিল। অথচ তাঁর সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে গণনাট্য সংঘে একটা ভুল ব্যাখ্যা এবং ধারণা উদ্দ্যেশগত ভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যদিও রবীন্দ্রনাটকের অসংখ্য প্রযোজনাও গণনাট্য করেছে অথচ গণনাট্যই রবীন্দ্র নাটকের সার্থক সম্ভাবনাময় পরীক্ষারস্থল হতে পারত। কিন্তু দর্শনগত দিক থেকে সেই সম্ভবনাকে গণনাট্য সংঘ স্বীকার না করায়, শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের 'চারঅধ্যায়', 'রক্তকরবী', 'ডাকঘর', 'বিসর্জন', 'মুক্তধারা' মঞ্চস্থ এক 'মুক্তধারা' বাদে অন্যগুলি যথেষ্ট সফল হয়েছিল। কিছুটা অপূর্ণতা থাকলেও শম্ভু মিত্র নিশ্চিতভাবেই গত পঞ্চাশ বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সর্বভারতীয় নাট্য-নির্দেশক। এই শক্তিতেই তিনি প্রমাণ করতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাট্য বাংলা নাটকের অমূল্য ও অক্ষয় সম্পদ। শম্ভু মিত্র সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে বাংলা নাটকের সংযুক্তিকরণ এবং বাণিজ্যিক থিয়েটারের সীমাবদ্ধতাকে ঘোচানোর জন্য নিজস্ব পন্থায় অবাধ ধ্রুপদী নাটকের আদলে জীবন ও শিল্পের প্রতি অসম্ভব ভালোবাসা থেকে রবীন্দ্রনাটকের নবনির্মাণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাব ও নাট্যভাষার স্তরবিন্যাসের যে সূক্ষ্ম বিভাজন, তা বুঝতে শম্ভু মিত্র যে সুগভীর অন্বেষণ করেছিলেন, পরবর্তীকালের নাট্যকারেরা তা করেননি। তাই শম্ভু মিত্রের যোগ্য উত্তরসূরী আমরা পায়নি। নাটককার রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবের সঙ্গে নাট্যকার শম্ভু মিত্র একাত্ম হতে পেরেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপের উচ্চারণের বৈভব ও ঐশ্বর্যকে মথিত হয়ে রবীন্দ্রনাটকের এক অনুপম নাট্যভাষা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নাট্যসংলাপের শব্দচয়নের স্তরভেদের অনুষঙ্গে নাটককার তাঁর ইপ্সিত ভাববস্তুর ইঙ্গিত দেন। কিন্তু নাটককারের লিখিত সংলাপে সুর নেই, তাই নাট্যকারকে সেই সংলাপের শব্দাবলীতে চরিত্রের স্তরবিভাজন অনুযায়ী যথাযথ সুরবৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে হয়। নাটককারের প্রতি নাট্যকারের অন্বেষণে ফাঁকি পড়লে নাট্যবস্তুর ভাবমোক্ষণে তা অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাই অপরিসীম শ্রদ্ধায় আনত হয়ে নাট্যকার শম্ভু মিত্র নাটককার রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাটকে চিত্রকল্পনার ঘনঘটা ছিল এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকার হওয়ার কারণে তাঁর নাটকে সুরের বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এটি শম্ভু মিত্র সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করে যথাযথ সুর প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন। ফলে নাট্যকার শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাটকের সংলাপে সত্যিকারের প্রাণ ও গতির সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের যুক্তিনিষ্ঠতার প্রত্যক্ষ প্রভাবে শম্ভু মিত্রের থিয়েটারে যুক্তিবাদ প্রাধান্য পেয়েছিল। আসলে নাট্যকার শম্ভু মিত্র দায়িত্বশীল অভিনিবেশে নাটককার রবীন্দ্রনাথের নাটকের সুগভীর অমৃত সাগরে ডুব দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাটকে অবগাহন করার জন্য পরিশীলিত অনুশীলন করে শম্ভু মিত্র নিজেকে যোগ্যতম করে তুলেছিলেন। তাই প্রখ্যাত নাট্যপরিচালক বিভাস চক্রবর্তীর মন্তব্য,

''তাঁর সৃষ্টির কেন্দ্রে মানুষকে রেখেছেন তিনি, ঘটনা বা পরিস্থিতিকে নয় । তাই যখন সমষ্টির নামে গোষ্টির নামে আসলে স্বার্থান্বেষী কিছু ব্যক্তি মানুষের মিলিত চক্র আঘাত করে অনুভূতিপ্রবণ ন্যায়পরায়ণ একক কিংবা একাকী মানুষকে তখনি রক্তাক্ত হতে দেখি তাঁকে। তাই রবীন্দ্রনাথের এত নিকটে তিনি যেতে পারেন ।''[২]

'চার অধ্যায়' (১৯৫১)

প্রথম অভিনয় ২১শে আগস্ট, ১৯৫১ সাল, শ্রীরঙ্গম মঞ্চ । স্বরচিত 'বিভাব' যেমন বিস্ময়ের তেমনি এই বছরে আরো অত্যধিক বিস্ময়ের ছিল নাট্যকার শম্ভু মিত্রের 'চার অধ্যায়' প্রযোজনা । বিস্ময়ের কারণ এটি রবীন্দ্রনাথের নাটক নয়, উপন্যাস । তাই মঞ্চে উপস্থাপিত করার জন্য লেখা নয় এর সংলাপ । ফলে ভাষাকে নাটকীয় করে প্রাণবন্ত করার কাজটি ছিল অত্যন্ত দুরূহ । রবীন্দ্ররচনা মঞ্চায়নের অভিষেকে সেই দুরূহতম কাজটি সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছিলেন নাট্যকার শম্ভু মিত্র এবং এই প্রযোজনাটি পঞ্চাশ-ষাটের দশক এমনকী সমকালীনতার তাৎপর্যে সত্তরের দশকেও দীর্ঘকাল ধরে মঞ্চস্থ হয়েছিল । এই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিবর্তমান ভারতবর্ষে 'চার অধ্যায়' দর্শককে মুগ্ধ করেছে, ভাবিত করেছে এবং অনুরণিত করেছে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষঙ্গে । আরো আশ্চর্যের বিষয় নাট্যরূপ দেবার সময় শম্ভু মিত্র উপন্যাসটির সাধারণ ধর্মকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। মঞ্চায়নের পর শম্ভু মিত্র বলেছিলেন যে, এই নাটক মঞ্চস্থ করে তারা খুব ভালো করেছিলেন। তিনি নাটকটি মঞ্চস্থ করে কাদের ভালো করেছিলেন? তিনি কি তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সদ্য দ্বি-খণ্ডিত স্বাধীন ভারতবর্ষের অস্থির সমাজের মঙ্গলার্থে চরমপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিকে মোহমুক্ত হওয়ার বার্তা প্রদান করেছিলেন!

উপন্যাসের চারটি অধ্যায়ের মতো নাটকটিও চারটি অঙ্কে বিন্যস্ত ছিল । সমকালীন সশস্ত্র রাজনৈতিক পটভূমিতে রাজনৈতিক অনুষঙ্গে এক অনন্য প্রেমের কাহিনীকে প্রতিস্থাপিত করে নাটককার যেমন বার্তা প্রদান করেছেন রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি, ঠিক তেমনি শম্ভু মিত্রও এ প্রযোজনা করে স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে রাজনীতির কিছু মৌলিক সমস্যাকে উত্থাপিত করেছিলেন। রাজনৈতিক হিংসা প্রবেশ করেছে অতীন্দ্র ও ইলার ব্যক্তিগত জীবন পরিসরে। অতীন্দ্র হৃদয়াবেগের তাড়নায় এলার কাছে এসে আর ফিরে যেতে পারেনি, রাজনৈতিক ঘূর্ণিপাকে দলেরই আদেশানুযায়ী সে এলাকে হত্যা করে। রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়ে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদের রূপ মঞ্চস্থ করে সমকালীন রাজনীতির কিসের প্রতিভাস সৃষ্টি করছেন শ্রী মিত্র । দ্বিতীয় অঙ্কে কালীপ্রতিমা, জবাফুল; তৃতীয় অঙ্কে ঝড়ের ব্যবহার এবং পুরাণ বা মহাজাগতিক কিছু প্রতিবেশ সৃষ্টি করার ফলে শম্ভু মিত্রের 'চার অধ্যায়' সৃষ্টিতে রাজনৈতিক অনুষঙ্গ স্পষ্টতর হয়েছে । 'চার অধ্যায়' প্রযোজনাটির আকর্ষণ

প্রয়োগকৌশলের অভিনবত্বও, যার ফলে উপন্যাসকে নাট্যে রূপান্তরের এই প্রয়াস জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল ।

''সূত্রধার গল্প সুরু করল । সেই গল্প মোড় নিয়ে নাটকের মোহনায় প্রবেশ করল, নাটক সুরুর সংস্কৃত ঘেঁষা পদ্ধতিটি নূতনত্ত্বের স্বাদ এনেছে নিঃসন্দেহেই ...। গল্প এলা ও ইন্দ্রনাথের পরিচয়ের মোড়ে পৌঁছুলে সূত্রধারের কণ্ঠ আশ্রয় ত্যাগ করে এলা ও ইন্দ্রনাথের নেপথ্য অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যেভাবে দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়েছে তার জন্য পরিচালকের প্রশংসাই করতে হয় ।...যাঁরা নাট্যমোদী,...তাঁরা নাটকের প্রয়োগক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান পাবেন ।চার অধ্যায় তারই ইঙ্গিতময় নতুন এক অধ্যায় তুলে ধরেছে।''[৩]

'রক্তকরবী' (১৯৫৪)

প্রথম অভিনয় ১৯৫৪ সালের ১০ই মে, রেলওয়ে ম্যানশন ইনস্টিট্যুট মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাট্যকার শম্ভু মিত্রের সৃষ্টিতে পুনর্জন্ম লাভ করেছিল । বহুরূপী'তে সমস্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলেও ১৯৫২ তে প্রথম সমস্যা দেখা দেয়, তুলসী লাহিড়ী, কালী সরকার, সবিতাব্রত দত্তরা দলের থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরত্ব তৈরী করেন, এঁদের ছাড়াই কিন্তু রক্তকরবী ইতিহাস তৈরী করে ফেলেছিল । বাংলা উপন্যাসের জগতে যেমন তিন দিগন্তের সীমা উন্মোচিত করেছেন ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, তেমনি নাট্যসৃষ্টিতে 'নবান্ন', 'চার অধ্যায়', আর 'রক্তকরবী' সৃষ্টি করে শম্ভু মিত্র সেই ত্রিগুণাতীত সত্তার দিগন্তকে উদ্ভাসিত করেছেন।

''শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায়, খালেদ চৌধুরীর মঞ্চ পরিকল্পনায় ও সংগীত প্রয়োগ, তাপস সেনের আলোর কাব্যে, দেবব্রত বিশ্বাস ও সুচিত্রা মিত্রের গানের শিক্ষায় 'বহুরূপীর'র অভিনয় শিল্পীরা দেশবাসীর কাছে রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে উপহার দিলেন । গোঁড়া রবীন্দ্রভক্তদের কেউ কেউ শোর তুললেন, 'বহুরূপী' নাকি রবীন্দ্রনাথকে বিকৃত করেছেন, তাঁকে কমিউনিস্ট বানিয়ে তোলা হয়েছে কিন্তু শম্ভু মিত্র প্রমাণ করলেন রবীন্দ্রনাথের সংলাপ একটিও না বদলে তার তাৎপর্যকে কত গভীর ও সময়-সংলগ্ন করে তোলা যায় ।রবীন্দ্রনাথ যে পৃথিবীর আধুনিক নাট্যকারদের অন্যতম, এ প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে শম্ভু মিত্র তা প্রমাণ করলেন ।''[৪]

নাট্যকার শম্ভু মিত্রের নাট্যের নবাবিষ্কৃত কাব্যভাষার মাধুর্যে সৃষ্টি হয়েছিল সমকালীন ও সর্বকালীন যুগদর্পণ 'রক্তকরবী' । ১৯৫৪ সালের ২১শে ডিসেম্বর বুধবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় নাট্যোৎসবে প্রথম যে বাংলা নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং শ্রেষ্ঠ নাটক বলে বিবেচিত হয়েছিল তা ছিল 'রক্তকরবী'। জাতীয়স্তরের এই বিরল সম্মান ও স্বীকৃতিতে প্রতিটি বাঙালির গর্ব করা উচিত। এই নাটকে অভিনেতা রূপে শম্ভু মিত্র শ্রমিক চরিত্রে কয়েকজন লড়াকু ট্রাম শ্রমিককে ব্যবহার করে স্পষ্টতর রাজনৈতিক বার্তা প্রদান করেছিলেন। 'রক্তকরবী' শুধু তৎকালীন সময়ে নয় স্থান- কাল-পাত্র নির্বিশেষে আজও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক

এক রাজনৈতিক নাটক। বিরতিহীন এই নাটকে নাটকের সংলাপের নূতনত্বে ও অভিনবত্বে অপাংক্তেয় নাটককার রবীন্দ্রনাথের অভিষেক ঘটেছিল নাট্যকার শম্ভু মিত্রের নবাবিষ্কৃত 'কথ্য ভাষা'র মধ্যে দিয়ে।

'মুক্তধারা' (১৯৫৯)

'রক্তকরবী'র সাফল্যে উচ্ছ্বসিত ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে বহুরূপী 'মুক্তধারা' মঞ্চস্থ করে ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৯ সাল, নিউ এম্পায়ার মঞ্চে। 'মুক্তধারা' নির্বাচনের নেপথ্যে সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছে। এ নাটক শোষিত, নিপীড়ত শিবতরাই-এর সাধারণ শ্রেণীর মানুষের অত্যাচারিত হওয়ার কাহিনী। উত্তরকূটের উপরতলার মানুষেরা ক্ষমতা ও বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করে শিবতরাই-এর মানুষদের বঞ্চিত করেছে। কিন্তু যুবরাজ অভিজিৎ আত্মদানের মধ্যে দিয়ে সেই বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে প্রতিরোধ করেছে। এই ঘটনার সূত্র দিয়ে আভাষিত হয়েছে রাজনৈতিক অনুষঙ্গ ও জটিলতা।

'বিসর্জন' (১৯৬১)

রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবর্ষে অর্থাৎ ১৯৬১ সালের ১১ই জানুয়ারী, দিল্লির আইফ্যাক্স মঞ্চে বহুরূপীর প্রযোজনা ছিল 'বির্সজন' নাটক। রাজনৈতিক দর্শনের অনুষঙ্গে রবীন্দ্র-কাব্যনাট্য 'বির্সজন' নাটক শম্ভু মিত্রের নির্দেশনার শক্তিতে মহত্ত্বের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছিল। এটিও বহুরূপীর নাট্যোৎসবে আভিনীত হয়। অস্থির সময়ের সমাজে হিংসার রূপ কত বিচিত্র ও জটিল হয়ে ওঠে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'বির্সজন' নাটক। প্রেম ও প্রতাপের দ্বন্দ্ব শুধু নয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে দিক্‌ভ্রান্ত করে, রাজদ্রোহী হয়ে ওঠার সাহস শুধু রঘুপতি একাই দেখাননি, এমন রাজদ্রোহীতার ছবি ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক চক্রান্তের বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

''আজও পৃথিবীতে অজস্র রাজনৈতিক বেদীর সামনে আদর্শের নামে, ভবিষ্যতের নামে, ঐতিহ্যের নামে—ব্যক্তিগত মানুষের সুখ দুঃখ, তার আশা, তার ভালবাসা, সমস্ত কিছুকে অবজ্ঞায় ভুলুণ্ঠিত করে এক বিরাট নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে।''[৫]

যদিও নাটককার রবীন্দ্রনাথের 'বির্সজন' নাটকের অভিমুখ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত সমাজজীবন, কিন্তু নাট্যকার শম্ভু মিত্রের 'বির্সজন' নাটকের অভিমুখ হয়ে দাঁড়ায় তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক জাঁতাকলে পড়ে যাওয়া সাধারণ মানুষ; যারা হয়তো রাজনৈতিক অনুষঙ্গে সেই ভয়াবহ প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে 'বির্সজন' নাটক থেকে জীবনে চলার পথের পাথেয় সংগ্রহ করে নিতে পারবে। রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে নক্ষত্রমাণিক্য তার নিজের দাদা রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে অপসারিত করার জন্য মোঘল

সৈন্যদের নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণের কূট পরিকল্পনা করে । ১৯৬০-৬১ সালের স্বাধীন ভারতবর্ষের অস্থিরতায় পঙ্কিল রাজনীতির অনুষঙ্গে শম্ভু মিত্রের এই নাটক নির্বাচন বিশেষ তাৎপর্যবাহী । এই সময়কালে রাষ্ট্রনীতির কারণে অথবা রাজনৈতিক ভণ্ড নীতির অনুশাসনে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতাকে চূড়ান্তভাবে হেনস্থা করা হয়েছে । 'চার অধ্যায়' থেকে শুরু করে 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', এবং 'বিসর্জন'—ক্রমান্বয়ে এই চারটি প্রযোজনা রাজনৈতিক অনুষঙ্গে একটি সূক্ষ্ম পারম্পর্যে সংযুক্ত ।

রাজা (১৯৬৪)

প্রথম অভিনয় ১৯৬৪ সালের ১৩ই জুন, নিউ এম্পায়ার মঞ্চে । শেষ অভিনয় ১৯৭৮ সালের ২৮শে মে, এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস । বহুরূপী তাঁর প্রচার পুস্তিকায় ঘোষণা করে, ''রাজা । অন্ধকারের রাজা । যে অন্ধকারের কাছে নিজেকে নিবেদন করতে শিখতে হয় ।''[৬]

এই ঘোষণায় সুস্পষ্ট ভাবে সমকালীন ভয়ংকর রাজনৈতিক অন্ধকারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং সেই অন্ধকারকে সময়ের অনুভবে উপলব্ধি করলে আলোর সন্ধান পাওয়া যাবে । যেমন করে সুদর্শনা অন্ধকারের রাজাকে আলোর মাঝে উপলব্ধি করতে চেয়ে নিজের আত্মোপলব্ধি ঘটাতে পেরেছে ।

''চার অধ্যায়', 'রক্তকরবী' বা এমনকী 'বিসর্জন'-এর সঙ্গে যে রাজনৈতিক অনুষঙ্গ যুক্ত হয়ে আছে 'রাজা'য় তা নেই, সেখানে মূল জোর পড়ছে ব্যক্তিমানুষের আত্মোপলব্ধির ওপর ।''[৭]

কিন্তু ব্যক্তিমানুষের আত্মোপলব্ধিও সূক্ষ্ম রাজনৈতিক অনুষঙ্গে সমাজকে আলোর ঠিকানা প্রদান করতে পারে । রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকটি নির্বাচনের নেপথ্যে শম্ভু মিত্র সমকালীন রাজনৈতিক অনুষঙ্গে অনুরণিত হয়েছেন, কারণ সে রাজার ধ্বজায় মধুর পদ্মফুলের মধ্যে কঠিন বজ্র আঁকা । 'রাজা' নাটকে সুদর্শনার অন্তরাত্মার উপলব্ধি, সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার দ্বানদ্বিক সংলাপের মধ্যে দিয়ে চেতনাতীত ও স্পর্শাতীত রাজাতে পৌঁছানোর যে চেষ্টা তাতে চরিত্রগুলির সাথে সাথে আমরাও অস্থির হয়ে উঠি । আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা উদ্‌ভাষিত হয়েছে এই নাটকে । এই নাটককে রূপক নাটক বললে সব বলা হয় না, একটু সচেতন প্রয়াসে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হয় যে, নাটককার রবীন্দ্রনাথ সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যাকে অনুধাবন করে রাজনৈতিক অনুষঙ্গে সমাজের সুউচ্চ ভিত্তিপ্রস্তর নির্মার্ণ করেছিলেন যার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমিতে পৌঁছানো যায় । দিনাবসানে আলোর মায়া ত্যাগ করে এক রহস্যঘন অন্ধকারের সামনে আমরা একক ভাবে একটা সম্পর্ক স্থাপন করি । এই ঘনায়মান অন্ধকারের নেপথ্যে আমাদের আপন রাজা বিরাজ করেন । কিন্তু

আমরা জানিনা যে, সেই অন্ধকারের রাজার কাছে নিজেকে কিভাবে নিবেদন করতে হয়! সেই কষ্টার্জিত অনুভবের শিক্ষায় দর্শককে শিক্ষিত করে তোলার বাসনায় 'রাজা' নাটকের মঞ্চায়ন। আসলে 'রাজা' নাটকের অন্ধকার সমকালীন যুগের রাজনৈতিক অন্ধকার, সেই কঠিন অন্ধকার অনুভব করতে পারলে, তবেই পৃথিবীর এই চঞ্চল বসন্তোৎসবে রাজাকে চিনে নেওয়া সম্ভব। নচেৎ এই প্রচণ্ড ভয়ংকর রাজনৈতিক যুগান্ধকারে চিরতরে হারিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই । তাই জীবনের জন্য আলোর সন্ধানে ভীষণ কঠিন, নির্দয়, মায়া-মমতাহীন সত্যকে জানতে পারলে রানী সুদর্শনার মত আমাদেরও আত্মোপলব্ধি ঘটবে।

তথ্যসূত্র

১. অসিত মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রনাটক ও শম্ভু মিত্র', নাট্যচিন্তা বর্ষ ১৫, শম্ভু মিত্র সংখ্যা, মে'৯৭-অক্টো'৯৭, পৃ ৫৫

২. বিভাস চক্রবর্তী, 'শিল্পীর মর্যাদার প্রতীক', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ এপ্রিল '৯২

৩. চিত্তরঞ্জন ঘোষ, 'প্রসঙ্গ ঃ চার অধ্যায়', বহুরূপী সংখ্যা ৪৬, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃ ২

৪. বিষ্ণু বসু, 'শম্ভু মিত্র ঃ নাট্যের নন্দন', গণনাট্য, তেত্রিশ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর–অক্টোবর, ১৯৯৭, পৃ. ১১৭

৫. বহুরূপী, বিশেষ বহুরূপী প্রযোজনা-১, সংখ্যা ৬৯, ১মে ১৯৮৮, পৃ ২৩৮

৬. বহুরূপী, বিশেষ বহুরূপী-প্রযোজনা ১, সংখ্যা ৬৯, ১লা মে ১৯৮৮, পৃ ২৬০

৭. সৌমিত্র বসু, 'সত্তর বছর ধরে বাংলা নাটক ও রবীন্দ্রনাথ, সম্পা. সুমিতা চক্রবর্তী, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও একুশ শতকের বাঙালি', বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশকাল ২৫ বৈশাখ, ১৪১৮, পৃ ৫৬

উত্তর দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতিতে রামকথার পরম্পরা

সঙ্গীতা প্রামানিক*

একথা প্রতিষ্ঠিত যে, প্রাচীন কালে মানুষ চিত্তবিনোদনের জন্য মুখনিঃসৃত অনেক কথাই বিভিন্ন ভঙ্গীমায় প্রকাশ করেছে। কণ্ঠনিঃসৃত এই কথাই পরবর্তী কালে নানান সুরের দ্বারা পরিবেশিত হয়ে লোকসঙ্গীত রূপে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে ড. দুলাল চৌধুরীর মন্তব্য- ''লোকসঙ্গীতের উৎস সন্ধানে তাই আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে আদিম মানব সমাজে, যেখানে জীবনের প্রয়োজনে সঙ্গীতের উদ্ভব হয়েছিল একদিন। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে লোকসঙ্গীতের জননী হল আদিম সঙ্গীত।''[১] গানগুলির কোনো নির্দিষ্ট রচয়িতা থাকে না, গ্রামীণ মানুষজন সংঘবদ্ধ ভাবে তাদের নিজস্ব ভাষায় গেয়ে থাকেন। আর এই সঙ্গীতগুলি পরিবেশনের সময় লোকজন মনে করে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে গায়। কারণ এর কোনো লিখিত রূপ থাকে না। প্রত্যেক লোকসঙ্গীতে একেক ভাষীকের আবেগ, অনুভূতি এমন ভাবে মিশে থাকে যে তা লোকসাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ হয়ে ওঠে।

গ্রামের মানুষজন লোকসঙ্গীতগুলি গায় নিজের মতো করে। গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে লোকসঙ্গীতের বিশ্লেষণে বরুণ কুমার চক্রবর্তী বলেছিলেন- ''যে শিল্পী যে অঞ্চলের তিনি সেই অঞ্চলের লোকসঙ্গীতই সব থেকে ভালো করে গাইতে পারবেন। কারণ লোকসঙ্গীতে ভৌগোলিক প্রভাব বড়ো বেশি। Context থেকে text-কে আলাদা করা যাবে না।''[২] লোকসঙ্গীত সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি আরো বলেছেন যে- ''লোকসাহিত্যের অপরাপর বিভাগগুলির মত লোকসঙ্গীতও সংহত সমাজের সৃষ্টি এবং ব্যষ্টির পরিবর্তে তা সমষ্টির সৃষ্টি রূপেই পরিচিতি।''[৩]

লোকসঙ্গীতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছিলেন- ''লোকসঙ্গীতের রচয়িতা রূপে বিশেষ একজনকে স্বীকার করিয়া লইলেও দেখা যায়, তাঁহার রচনার মধ্যে ব্যক্তিগত মানস অপেক্ষা যে বিশিষ্ট লোক-সমাজের তিনি সভ্য, সেই সমাজের বিশিষ্ট মানসটাই তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়;- অনেক গান লক্ষ্য করিয়া ইহাই আমরা বুঝিয়াছি।''[৪] সুতরাং বলা যায় যে এভাবেই লোকসঙ্গীতের সৃষ্টি।

সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ মানুষজন চিত্ত বিনোদনের জন্য নানান দেব-দেবীকে আশ্রয় করে এবং পৌরাণিক মহাকাব্যগুলিকে নিয়ে নিজস্ব ভঙ্গিতে গান করে চলেছে।

*গবেষক, বাংলা বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়।

সেরকমই 'রামায়ণ' মহাকাব্য অঞ্চল বিশেষে নানান নামে পরিচিত হয়ে আছে। রামায়ণ ভিত্তিক লোকগানের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে আগে এই গানগুলি কোথা থেকে সৃষ্টি হয়েছে সেদিকে দেখতে হবে। রামায়ণ কাব্যটি যে সময়ে সৃষ্টি তখন 'সঙ্গীত' বলে কোনো শব্দ ছিল না, সে সময় ছিল গান। সে সময় ছিল কিছু বৈদিক গান, যেমন- উদ্‌গান, সামগান, গ্রাম গেয় গান, অরণ্য গেয়, ঊহ-ঊহ্য প্রভৃতি। তখন অর্থাৎ রামায়ণ-এর কালে 'গ্রাম রাগ' ব্যবহৃত হতো। রামকথা নিয়ে গান প্রসঙ্গে একালের এক নবীন গবেষক লিখেছিলেন- ''সেকালের চারণরা অর্থাৎ 'নট' সম্প্রদায়-ভুক্ত কুশীলবেরা (পরবর্তীকালে গল্পকারগণ এঁদের রামচন্দ্রের যমজ- পুত্র রূপে অর্থাৎ লব ও কুশ রূপে দেখিয়েছেন) রাম-কথা বা রাম-চরিতকে এই গাথা গানের সাহায্যে বংশ-পরম্পরায় প্রচার করেছেন। এই গাথা-গান থেকে চ্যবন রচনা করেছিলেন রামকথা বা রাম-চরিত।''[৫] ধীরে ধীরে যুগের পরিবর্তনে এবং মানুষের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই রামকথার বিস্তার সমগ্র ভারতের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে লোকায়ত রামকথা সম্পর্কিত আঞ্চলিক গানগুলি শুধু আনন্দ বিনোদনের জন্য গাওয়া হতো। এখানে রাম তাদের ঘরের মানুষ ও ঘরের দেবতা হয়ে উঠেছে। এই গানগুলি বংশ পরম্পরায় আজও বহমান।

ড. দীপক কুমার রায় বলেছিলেন- ''লোকনাট্যের প্রতিশব্দ রূপে উত্তরবঙ্গে পালা, গান প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত আছে।''[৬] ঠিক সেরকম ভাবেই উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে রামকথাকে কেন্দ্র করে নানা গান প্রচলিত আছে। যেমন-

রামগান

রাজধারী বা লঙ্কার গান লক্ষ্মীয়ালা গান

এই সমস্ত গানগুলিতে কখনও রামকে নায়ক করে গান গাওয়া হয়েছে আবার কখনও রাবণকে নায়ক করে গান গাওয়া হয়েছে। গানগুলির ছন্দ, অলঙ্কার ভাষার ব্যবহারও ভিন্ন হয় এবং সেই সঙ্গে তারা নিজস্ব অঞ্চলের ভাষার বৈচিত্র বহন করে চলেছে। রামকথা-কে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে যে গানগুলি রয়েছে নিম্নে এই গানগুলি আলোচনা করা হয়েছে।

১. রাজধারী বা লঙ্কার গানে রামায়ণ প্রসঙ্গ

বাঙালির কাছে রাম অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতারূপে পূজিত হয়ে আছেন। হিমালয় উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চল, উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়া, গোয়ালপোখর-২, চোপড়া ইত্যাদি অঞ্চলে রাজধারী বা লঙ্কার গানের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। এই গানে রাবণের দুঃখ বিরহই বেশি লক্ষ করা যায়। এখানে গানের তুলনায় নাটকেরই প্রাধান্য বেশি, কারণ হিসাবে

বলা যেতে পারে এটি মূলত সংলাপধর্মী। রাজধারী গানটি লাহাংকারী সুর সহযোগে দীর্ঘ বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হয়। লাহাংকার-এর অর্থ হল দুঃখ বা বিরহ। তরাই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতরূপে প্রচলিত লাহাংকারী।

রাজধারী কথার অর্থ 'রাজার রাজকীয় ভাব'। এই রাজধারী গান মূলত রামায়ণ ভিত্তিক। এই গানে রাম গৌণ ভূ মিকায় থাকে, এখানে মুখ্য ভূ মিকায় থাকে রাজা রাবণ। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডকে অবলম্বন করে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে। এই গানের কথা রামের বনবাস থেকে শুরু করে সীতা উদ্ধার অর্থাৎ লঙ্কাকাণ্ডে গিয়ে শেষ হয়।

রাজধারী গান পরিবেশিত হয় বসে বসে। পালার প্রারম্ভে মূল গায়ক থাকেন একজন এবং সঙ্গে থাকেন কয়েকজন বাদ্যযন্ত্রী। মঞ্চটির একদিকে দর্শকদের সঙ্গেই বাদ্যযন্ত্রীরা বসে থাকে এবং শিল্পীরা বসে রাবণের উচ্চসিংহাসনের কাছাকাছি।

এই গানের আসর যাত্রার মঞ্চের ন্যায় এবং মঞ্চটিকে বলা হয় লংকা বান্ধা। এই মঞ্চটির উপরে অতি উচ্চাকৃতি একটি বিশেষ স্থানে লঙ্কেশ্বর রাবণের জন্য সিংহাসন বানানো থাকে, সিংহাসনটির উচ্চতা প্রায় ৯ফুট, চওড়া ৪ফুট এবং লম্বা প্রায় ৮ফুট। মঞ্চটি বৃত্তাকার হয় আর মঞ্চটির পাশেই বাঁশের তৈরী অশোকবন থাকে যেখানে সীতা দেবীকে বন্দী করে রাখা হয়।

রাজধারীর শিল্পীরা প্রায় সারা রাত ধরে পালা গান পরিবেশন করে। এই সময় কুশলীবরা কখনো নির্বাক আবার কখনো সবাক অভিনয় করে। এই গান পরিবেশনের সময় শিল্পীরা মুখোশ পরে অভিনয় করে। রাবণ মুখ্য চরিত্র হওয়ায় বিশালাকৃত তার মুখোশটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মুখোশটি প্রায় দেড় ফুট চওড়া, আড়াই ফুট লম্বা। চরিত্র অনুযায়ী মুখোশগুলির রং আলাদা আলাদা থাকে। এগুলির রং মূলত কালো, সাদা, লাল, নীল রং- এর হয়ে থাকে। যেমন- হনুমানের মুখোশের রং লাল, কুম্ভকর্ণের মুখোশের রং ভয়ংকর কালো রং-এর, সূর্পণখার মুখোশের সংখ্যা দুটি; একটি রং খয়েরি এবং আরেকটি সাদা রং-এর।[৭]

পালা শুরু হওয়ার পূর্বে প্রথমে যে জায়গাটিতে পালা অভিনীত হবে সেখানে মন্ত্র দিয়ে একটি জলভর্তি ঘট রাখে এবং যতদিন পর্যন্ত পালাটি চলে ততদিন তারা এই জলভর্তি ঘটকে আসরের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রাখে। মন্ত্র পড়া এই জলটি তারা আসরের চারপাশে ছিটিয়ে দেয়। এর পেছনে একটি কারণ রয়েছে। তাদের বিশ্বাস মন্ত্র পড়া জলটি ছিটিয়ে দিলে তাদের আসরের উপর কেউ কুনজর বা কেউ খারাপ করতে পারবে না। তাদের মন্ত্রটি নিম্নে তুলে ধরা হল—

বনে বনে কনু সারা চৌদিকে ফিকায় দিনু লোহার গাজার

লঙ্কার দশ দুয়ার বন্ধু রতিত চরায় এতেক নাথ রদন দেবী
চরায় ঘা শীত বন্ধু আপন গুরুর থা।
ফুল বন্ধু তুলসী বন্ধু পবন বন্ধু আল্লার পর কাল্লা ত্রিশ কাল্লাব
পর ধরতী। ধরতীর পর বিছানা, বিছানার পর .....
..... ভগবান।।
আকাশে দুম দুম মঞ্চে পানি মোর শরীর বন কনু লোহার....
..... লোহার বজ্র খিল।।
বজ্রে বান্ধু বজ্রে কেবার বজ্রে বান্ধু দশ দুয়ার.....
..... আমার জীবের প্রহরী তুমি।।[৮]

মন্ত্র শেষ হবার পর পালা আরম্ভ আসর বন্দনা দিয়ে। আসর বন্দনার সময় রাম, কৌশল্যা, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, নারায়ণ, হনুমান, বালী, বালীর পুত্র অঙ্গদ ও দেবী সরস্বতীর চরণ বন্দনা করা হয়ে থাকে। রাজধারীর গানের বন্দনা অংশ-

'ওহে রাম বন্দ, বন্দ রামের যুগল চরণ
ও যে পথমে বন্দিনু রামের যুগল চরণ হে
ও যে ভক্তি করে বন্দি মাতা কৌশল্যার চরণ
রামের যুগল চরণ হে।
ও যে শ্রীরাম লক্ষ্মণ বন্দু ভরত শত্রুঘ্ন
ওই যে চারি অংশ জন্মিল নারায়ণ, হে রাম বন্দু
রামের যুগল চরণ।
ব্রহ্মারে পুত্র বন্দু ওরে বুড়া জাম্বুবান
রামের যুগল চরণ
ওই যে পবণের পুত্র বন্দু বীর হনুমান
রামের যুগল চরণ।
আইস বাছা হনুমান চেহরে লেহ বাস
গাইন বাইনের কণ্ঠে ও তুই দিবোগে হুলাস
রামের যুগল চরণ।

ওই যে নল নাল বন্দু মুই বালীর চরণ
ওই যে বালীর যে পুত্র বন্দু অঙ্গদ মহাবীর
বন্দু রামের যুগল চরণ।
পুরবে ধরম বন্দু পছিমে পইকম্বর
উতোরে কৈলাশ বন্দু দক্ষিণে সাগর।
রামের যুগল চরণ।
আদ্য গুরু চরণ বন্দু শিরে ছত্র ধর
শিক্ষা গুরু চরণ বন্দু আরো বাপ মাও
হে রাম
রামের যুগল চরণ।
আইস মাগো সরস্বতী লেও চেহরের বাস
গাইন বাইনের কণ্ঠে মাগো হোবোগে হুলাস।'[৯]

এরপর ইন্দ্রের আগমন ঘটায় দুই ঋষির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পালার সূচনা হয়, আবার কোথাও কোথাও রাবণ ও বিভীষণের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পালার সূচনা হয়-

'বিভীষণ- দাদা, রামের সীতা রামকে দিয়া ভজিব চরণ
নিশ্চয় করিবে দয়া গোলোক নন্দন
দাদা, রাম হল দশরথ রাজার বেটা।
রাবণ- যদি রাজার বেটা
তবে শিরে কেন জটা?
বিভীষণ- রাম হণল পরম ব্রহ্মচারী
রাবণ- যদি ব্রহ্মচারী-
তবে সঙ্গে কেন নারী?
রাম যে মনুষ্য নয়
সেও আমি জানি
সীতা যে মনুষ্য নয়
করুণ মনুষ্য জানি,

সনক পুরের গুহক চন্ডাল
তাকে তুমি জান-
তার বাড়িতে ছিল রাম
দিন দশ বারো
জাতি কুলের ভেদ নাই
যথা তথা খায়
ভক্তিভাবে ডাকিলে রাম
চণ্ডালের বাড়ি যায়
সে রাম মনুষ্য বৈ-কী ?'[১০]

রাজধারী গানের আলোচনা প্রসঙ্গে এরপর আমরা যে কাহিনী পাই সেটি হল- মহীরাবণ ভদ্রকালীর কাছে রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে গেছে বলি দেবার জন্য। এই অবস্থা দেখে ভদ্রকালীর কাছে হনুমান মাছির রূপ ধরে প্রভু রামচন্দ্রের প্রাণভিক্ষা করে এবং ভদ্রকালীর ওপর হনুমানের ক্ষোভ দেখতে পাই-

'আমাকে ছাড়িয়া যদি
মহীকে করিস হিত
সর্বাংশ ডুবাইব তোমার
মন্দির মোহিত।'[১১]

২। লক্ষ্মীয়ালা গানে রামায়ণ প্রসঙ্গ

লোকগানের ধারায় উত্তরবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর অঞ্চলে 'লক্ষ্মীয়ালা' গান প্রচলিত আছে। এই গান মূলত রামায়ণ ভিত্তিক। এই গানকে কেউ কেউ লক্ষীমঙ্গল নামেও জেনে থাকেন। আসলে রাজবংশী সমাজের মানুষের কাছে এই গান লক্ষ্মীয়ালা এবং এদেশীয় মানুষের কাছে এই গান লক্ষ্মীমঙ্গল নামে পরিচিত। দেশীয় লোকেরা মূলত সীতাকেই লক্ষ্মীদেবী রূপে মনে করেন। সেই জন্য লক্ষ্মীয়ালা গান মূলত আশ্বিন-কার্তিক মাস থেকেই শুরু হয় এবং ফাল্গুন-চৈত্র মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। তবে বিশেষ বিশেষ সময়ে যেমন যমজ সন্তান হলে, নতুন ধান হলে এই গান মানুষ নিজেদের বাড়িতে দিয়ে থাকে এবং পালা করেও গ্রামের হাটে-বাজারে বসে। এই গান সম্বন্ধে নির্মলেন্দু ভৌমিক ব্যখ্যা করেছেন- ''রাজবংশী এবং দেশী পল্লীসমাজের কাছে 'সীতাদেবীই লক্ষ্মী'। দিনাজপুরে লক্ষ্মীর আরাধনা তিন

রকমের : আশ্বিন সংক্রান্তিতে হয় 'ক্ষেতিলক্ষ্মী'র পূজা জলপাইগুড়িতে যাকে 'ডাকলক্ষ্মী' বলে। নিখিল বাঙলায় আশ্বিন সংক্রান্তির দিন ধানগাছকে নিয়ে নানা অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বাস- এদিন ধানগাছে 'ফুল' আসে; এজন্যে সেদিন ধানগাছকে 'সাধ' খাওয়ানো হয়। জলপাইগুড়িতে সেদিন যে ছড়া বলা হয়, তা এই : আশ্বিন যায়, কার্তিক আসে/ মা লক্ষ্মী গভ্‌ভে বসে'। দ্বিতীয়ত, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন হয় 'খজাগর। তৃতীয়ত, ভক্তের মানসিক অনুসারে যে কোনো সময়ে অনুষ্ঠেয় 'লক্ষ্মী-র' অর্থাৎ লক্ষ্মীব্রত (জলপাইগুড়িতে বৈশাখ মাসে তিস্তানদীকে উপলক্ষ্য করে যে মেছেনীব্রত অনুষ্ঠিত হয়, তাতে ধানগাছের পাঁচটি স্তরকে লক্ষ্মী বলা হয়; গুছিলক্ষ্মী, ডাকলক্ষ্মী, অঘণলক্ষ্মী, পৌষলক্ষ্মী এবং তিস্তা নিজেই লক্ষ্মী)। ধান এবং লক্ষ্মীর সমীকরণ এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।"[১২] অর্থাৎ যে গান লক্ষ্মীবিষয়ক সেই গানই রামায়ণ আর সেই গানই লক্ষ্মীয়ালা নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে (উত্তর দিনাজপুর) লক্ষ্মীয়ালা গান প্রায় ত্রিশ বছর আগে থেকে প্রচলিত রয়েছে।

লক্ষ্মীয়ালা গানকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

লক্ষ্মীয়ালা গান

বারুয়ালী কল্‌মী

বারুয়ালী :

বারুয়ালী কথাটির অর্থ বোঝাতে গিয়ে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের ব্যাখ্যাই সর্বপ্রথম গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। তিনি বলেছিলেন- 'যদি হিন্দী 'বার' অর্থে 'বালক' ধরি, তবে বার + উয়ালী = বারুয়ালী পদকে সহজেই পাওয়া যায়। 'বালক' বলতে এখানে লব-কুশ, রামের যজ্ঞসভায় যারা রামায়ণ গান গেয়েছে। যদি ফারসী 'বার' বলতে সভা-রাজসভা-দরবার বুঝি, তাহলে রামের রাজসভার সঙ্গে এটিকে প্রত্যক্ষতই যুক্ত করে নেওয়া যায়। বাঙলায় প্রসারিত অর্থে এটির প্রয়োগও মেলে। কাজেই 'বারুয়ালী'র অর্থ দাঁড়াল: সাজসজ্জা করে সভাস্থলে, দু'জন বালক কর্তৃক অভিনয় গীতি।'[১৩] উল্লেখিত আছে কোচবিহারে রামায়ণ ভিত্তিক যে গান প্রচলিত আছে সেই কুশান গানই দিনাজপুর অঞ্চলে বারুয়ালী মানে পরিচিত।'[১৪] এই গানগুলি রাত্রিবেলা করে গাওয়া হয়। তিন থেকে সাত রাত্রি ধরে চলে এই গান। বারুয়ালী গানে রামায়ণের রাম, সীতা, লব-কুশ, হনুমান প্রভৃতি চরিত্র নানা সাজসজ্জায় ভূষিত হয়ে অভিনয় করে।

তবে বারুয়ালী লক্ষ্মীয়ালা গান দিনাজপুরের গান হলেও পূর্ব কোচবিহার অঞ্চলে গাওয়া হতো। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের লেখা থেকে। তিনি বলেছিলেন- ''কোচবিহারে হিন্দু সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠিত হবার পর, স্বভাবতই অনুমান করা যায়, সপ্তমী থেকে নবমী, এই তিনদিনই ছিল রামায়ণ পালাগীতি ও অভিনয়ের প্রকৃষ্ট সময়। তখন আর নিতান্ত সাদা-মাটা ভাবে, রূপসজ্জা না করে অভিনয় নয়। তখন রীতিমতো সাজসজ্জা করে সভা করে রামায়ণের গীত ও অভিনয়ের আসর বসত। একেই বলা হয়েছে 'বারুয়ালী লক্ষ্মীয়ালা'।"[১৫] কিন্তু দেখা যায় বর্তমানে এই বারুয়ালী লক্ষ্মীয়ালা গান দিনাজপুর অঞ্চলেও খুব একটা গাওয়া হয় না, প্রাধান্য দেওয়া হয় কল্‌মী গানকে।

কল্‌মী :

গাছের কলম করা থেকেই মূলত কল্‌মী শব্দটি এসেছে। সুতরাং কৃষিকর্মের মধ্যে এই নামটি সংযোজিত। এই প্রসঙ্গে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের মন্তব্য আবার তুলে ধরা যাক- ''দশমীর দিন উত্তর বঙ্গের রাজবংশী সমাজে পালিত হয়,'হালযাত্রা'। সে এক কৃষি-অনুষ্ঠান। বাড়ির উঠোনে লাঙ্গল ইত্যাদি কৃষিযন্ত্রাদিকে বরণ করা। একে 'যাত্রাসিদ্ধ'ও বলা হয়, কেউ কেউ বলে 'যাত্রাসী'। এদিন থেকে কৃষিকর্মের একটি পর্বের সূচনা হয়। 'কল্‌মী লক্ষ্মীয়ালা'র সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের, কৃষিকর্মের মাধ্যমে, সুন্দর ও সহজ যোগ অনুভব করা যায়।"[১৬]

উত্তর দিনাজপুর অঞ্চলে যে লক্ষ্মীয়ালা গান শোনা যায় সেই গান মূলত ধানগাছ রোপন সংক্রান্তিক। বায়রের কোনো শত্রু যেন তাদের ধান নষ্ট না করে দেয় এবং ঘরে রাখা সেদ্ধ ধান থেকে যেনো কোনো গাছ না বেড় হয়- ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই তারা এই গান গেয়ে থাকে। এই গানের সংঙ্গা স্বরূপ ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন- ''ক্ষেতিলক্ষ্মী' অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে লক্ষ্মীরূপা সীতা এবং তাঁর স্বামী-পুত্র-পরিবার অবলম্বন করে যে গান ও অভিনয়, তাই হল, 'কলমী লক্ষ্মীয়ালাণ'।"[১৭] এই গান গাওয়ার সময় থাকে একজন মূল গায়েন, তার হাতে থাকে চামর। আর সেই সঙ্গে থাকবে দুই জন দোহার, কর্তাল, ব্যানা, খোল বাদক এবং তিন নারীবেশী ছোকরা- একজন সাজে সীতা রূপে, দ্বিতীয় জন সাজে রামের বোন কবুজা এবং আর একজন সাজে রথের সারথীর বেশে। এছাড়াও রাম-সীতা-লক্ষ্মণ, কবুজাম হনুমান ইত্যাদি চরিত্ররা থাকে। মোট আটজন সদস্য থাকে । এই গান তিন রাত্রি ধরে গীত হয়। এই গান কোথাও বারোয়ারী ভাবে খোলা মাঠে আবারও কোথাও বা কারো বাড়িতে আসর বসিয়ে থাকে। এর জন্য কোনো মঞ্চের প্রয়োজন হয় না। উপরে ট্রিপল টাঙ্গিয়ে দিয়ে গোল জনতার মাঝে সঙ্গীত ও অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। গান শুরু করবার আগে পাঁচটি ঘট, চারটা কলার গাছ এবং কিছু ধান গাছের চারা

লাগে। চারপাশে চারটি ঘটে চারটি কলাগাছ এবং মাঝখানে একটি ঘট ও একটি ধানগাছ রাখতে হয়। এর সঙ্গে ছোতো করে টাটির বেড়া চারপাশ দিয়ে লাগিয়ে মণ্ডপ সাজানো হয়।

গানের সূচনা হয় আসর বন্দনার মধ্যদিয়ে। লক্ষ্মীয়ালা গানের বন্দনার অংশ-

'বন্দি রামের যুগলচরণ,
রাম বন্দি, লক্ষণ বন্দি, ভরত শত্রুগণ।
রাজা দশরথ বন্দি, মন্ত্রি জাম্বুবান
বন্দি, সুগ্রীব বানর কৈকেয়ী সুন্দরী
বন্দি সুমিত্রা সুন্দরী, মন্ত্রি জম্বুবান
একত বীর হনুমান, সীতা ঠাকুরাণী।'[১৮]

উত্তরবঙ্গের লোকায়ত সংস্কৃতিতে রামকথার ঐতিহ্য মূলত মৈথিলী সংস্কৃতির প্রভাবজাত। গান, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, ইত্যাদি নানা অনুষঙ্গে বার বার ফিরে এসেছে রামায়ণ প্রসঙ্গ। লক্ষীয়ালা গানের বারুয়ালী অংশ এবং কল্‌মী অংশের কাহিনী মূলত রামকথা নির্ভর। পরোক্ষভাবে লোকনাটক গুলিতে রামকথার প্রভাব পরেছে, ফলে বিষয় ও আঙ্গিকে রামায়ণের কথা আছে। এছাড়াও অনেক লোকনাট্যে বন্দনা গীতে রামকথার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে একজন আদর্শ চরিত্র হিসাবে। রামের এখানে দুর্বলতা নয়- ঐশ্বর্য মহিমা, আদর্শ, ত্যাগ, তিতিক্ষা, প্রধান লক্ষ্য। ফলে উত্তরদিনাজপুরের লোকায়ত সংস্কৃতির অঙ্গনে রামকথার ঐতিহ্য একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

তথ্যসূত্র :

১. চৌধুরী, ড. দুলাল, বাংলা লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অব্ ফোকলোর, কোলকাতা- ২০০৪, পৃ- ১৩৬
২. বসু রায় চৌধুরী, রীতেন্দ্র নারায়ণ (প্রধান সম্পাদক) পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, বিশেষ সংখ্যা , বাংলা সঙ্গীত মেলা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ২০১৪, পৃ- ১২৮
৩. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৭, পৃ-২৮৬
৪. ভৌমিক, নির্মলেন্দু, প্রান্ত উত্তর বঙ্গের লোকসঙ্গীত ২০১১, পৃ-১৯
৫. ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত), কোরক সাহিত্য পত্রিকা ১৯৯৮, পৃ-১৯১
৬. রায়, দীপক কুমার, হিমালয় সংলগ্ন উত্তর বঙ্গের লোকনাট্য, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৫, টেরাকোটা, তিলবাড়ি, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পৃ-১৪

৭. প্রাগুক্ত, পৃ-৫৪

৮. সংগ্রহঃ শ্রী দধী গণেশ, বয়স- ৫৮, গ্রাম-কামাত, পোঃ- দুলালিভীটা, গোয়ালপোখড়, জেলা- উত্তর দিনাজপুর

৯. রায়, দীপক কুমার, হিমালয় সংলগ্ন উত্তর বঙ্গের লোকনাট্য, ২০১৫, পৃ- ৫৩

১০. প্রাগুক্ত, পৃ- ৫২

১১. প্রাগুক্ত, পৃ-৫২

১২. ঘোষ, জগন্নাথ, একটি সমুদ্র পাখি বিহান (উত্তরবঙ্গ লোকসংস্কৃতি সংখ্যা) ২০০২, পৃ-২১-২২

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৪

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ- ২৩

১৮. সংগ্রহঃ ভবা বর্মন, বয়স- ৬২, গ্রাম-খোকসা, ইমাদপুর, পোঃ-রায়গঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর

‘বহিপীর’ নাটক : মূল্যবোধের সংঘাত

আশিস রায়*

সারসংক্ষেপ : ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শ্রেণি ও নবজাগ্রত পুঁজিপতি শ্রেণির মধ্যে চরম সংঘাত উঠে এসেছে ‘বহিপীর’ নাটকের মধ্যে। সামন্তসমাজের তুলনায় ধনবাদী সমাজের উদারতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ যেমন বিদ্যমান তেমনই পীর দরবেশদের অতিমাত্রায় ধর্মনিষ্ঠা, তাদের জোব্বার সম্মান প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে দেখা দিয়েছে তাদের অহং সর্বস্ব মন এবং একটা সময় এ সব কিছুর বিনাশ। সমস্ত জটিল ও কুটিল চিন্তা চেতনার মধ্য দিয়ে নব জীবনের ধারা বহমান।

মূল শব্দ : মূল্যবোধ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, পুঁজিবাদী, জমিদার

মূল অলোচনা

একজন মানবতাবাদী লেখক কখনই স্বপ্নলোকের আসনে খোশমেজাজে বসতে পারেন না। ছন্নছাড়া মানুষগুলোর কাছে তাকে বারে বারে ঘুরে ফিরে আসতে হয়। তাদের মনের কথা বুঝে নিতে হয়, তাদের অসহায় অবস্থার সাক্ষী থাকতে হয়। আর এর পরেই নিজের মানবিকতাবোধ থেকে তাদের মনে আশার সঞ্চার করতে হয়। সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ তাঁর ‘বহিপীর’ নাটকের মধ্যে যেন সেটাই তুলে ধরলেন। ‘বহিপীর’ নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে।

পরিবারসহ রেশমপুরের জমিদার হাতেম আলি ঢাকা যাচ্ছেন নিজের জমিদারী রক্ষা করতে। ‘সান্ধ্য আইনে’ তার জমিদারী নিলাম হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ঢাকায় গিয়ে বন্ধুর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে জমিদারী রক্ষা করবেন। তবে এই কথাটি তিনি পুত্র হাশেম আলী ও স্ত্রী খোদেজার কাছ থেকে গোপন রাখেন, তারা কষ্ট পাবে এই ভেবে। তাদেরকে তিনি জানিয়েছেন শারীরিক অসুস্থতার কারণে শহরে যাচ্ছেন ডাক্তার দেখাতে। ঢাকা যাওয়ার পথে ডেমরা ঘাটে এক অসহায় তরুণীকে দেখে খোদেজার মনে মায়া জাগে। খোদেজা তরুণীকে বজরায় জায়গা দেয়। আলাপ পরিচয়ে মেয়েটির নাম জানা যায় তাহেরা।। তাহেরা সৎ মায়ের সংসারে বড়ই অনাদরে মানুষ হয়েছে। সে ছিল তার বাড়ির একজন অতিরিক্ত সদস্য। বাবার কাছ থেকে সে যে কোনদিন স্নেহ পেয়েছে তা সে মনে করতে পারে না। সৎমা আর বাবা তাকে জোর করে বিয়ে দিয়েছে তার থেকে অনেক বড় বয়সের একজন

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

পীরের সঙ্গে। এই বিয়েতে তার কোন মত ছিল না। সে অসম বয়সী বিয়েকে মেনে নিতে না পেরে চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। বৃদ্ধ বয়সে বহিপীর বিয়ে করার পর নিজের স্ত্রীকে দেখতে না পেয়ে বেদনায় কাতর হয়ে পড়েছে। সমাজে সে একজন নামী মানুষ, তার বউ পালিয়ে যাবে সে এটাকে মেনে নিতে পারে না। তাহেরার বাবা পুলিশে খবর দিতে চাইলে বহিপীর বাধা দেয়। সে নিজেই তার স্ত্রীকে খুঁজতে যাবে জানিয়ে, চাকর হাকিকুল্লাসহ একটি নৌকা নিয়ে বার হয়ে পড়েন। ঝড়ের কারণে দুর্ঘটনা ঘটে। একটি ছোট খালের মধ্যে হাতেম আলীর বজরা আর বহিপীরের নৌকা ঢোকাবার সময় আঘাত লেগে নৌকাটা ডুবে যায়। হাতেম আলী বহিপীরকে উদ্ধার করেন এবং নিজের বজরায় আশ্রয় দেন ও নিজের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেন। বহিপীর যেন খুব কষ্টের মধ্যেই আছেন। পালিয়ে যাওয়া স্ত্রীকে খুঁজতে বেরিয়ে কি বিপদেই না পড়লেন।

> বহিপীর ।। (পাশের ঘরে, হঠাৎ চোখ ফেলে হাশেমের দিকে তাকিয়ে) যৌবনে শান্তি নেই, বৃদ্ধ বয়সেও শান্তি নেই। বরঞ্চ বৃদ্ধ বয়সেই অশান্তিটা মনটাকে যেন খিঁচিয়ে ধরে। অবশ্য মান-সম্মান, সম্পদ-সম্পত্তি আর সন্তানসন্ততির জাঁকজমকটা হয় বটে, কিন্তু সেটা যেন ছেলে ভুলানো খেলা। তাতে মনের অশান্তি কাটে না, আমার মনে শান্তি নাই। আল্লার ধ্যান করিলে শান্তি হয় বটে, কিন্তু ধ্যান করিবার জন্য প্রথমে শান্তি চাই সে শান্তি কোথায়?[১]

অশান্তির মধ্যেই যেন তিনি শান্তির খোঁজ পেয়ে গেলেন। তিনি জানতে পারলেন চাকরের মুখ থেকে জমিদার সাহেবের বিবি কাল ডেমরা ঘাট থেকে একজন অসহায় বিপদগ্রস্থ মেয়েকে আশ্রয় দিয়েছেন। এই মেয়েটিই তার নবপরিণীতা তাহেরা বিবি। বহিপীর তাহেরা বিবি বলে সম্বোধন করলে, সে উচ্চস্বরে জানিয়ে দেয় তাকে যেন বিবি বলে না ডাকে। এই বিয়েতে তার মত নেই। বহিপীরের বক্তব্য সে 'সাক্ষী-কাবিননামা' করে বিয়ে করেছে। এই 'সাক্ষী-কাবিননামা' তাহেরা মানতে চায় না। কেননা এই বিয়েতে সে মত দেয়নি। সে ঈদের গরু বা ছাগল নয়, যে যেমন খুশি তাকে ব্যবহার করবে। বহিপীর জানে যে সে তাহেরার উপযুক্ত নয়। তাহেরা তার সঙ্গে যাবে না। চতুর বহিপীর খুব সাবধানে কথা বলতে আরম্ভ করে। তাহেরা কোন কথাই শুনতে চায় না, তাঁর বলিষ্ঠ উচ্চারণ—

> তাহেরা।। (আবার বাধা দিয়ে) আমি আপনার কোন কথা শুনতে চাই না। আমার বাপজান আর সৎমা আপনাকে খুশি করবার জন্য আপনার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। আমি যেন কোরবানির বকরী। আপনি পুলিশে খবর দিতে পারেন, আমার ওপর জুলুম করতে পারেন। কিন্তু আমি

আপনার সঙ্গে যাব না। আপনি আমাকে দেখেন নি, আমিও আপনাকে দেখি নি। আর আপনাকে আমি দেখতেও চাই না।[২]

তাহেরা বহিপীরের দেখানো ভয়ে ভীত হয় না। সমাজের অনুশাসন সে মানতে চায় না। মাতৃহারা মেয়ের সাহস দেখে নিজেকে পীর হিসাবে পরিচয় দেওয়া বহিপীর মনে মনে ভয় পেতে থাকে। তাহেরার উত্তরোত্তর বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরে আকর্ষিত হতে থাকে জমিদার পুত্র হাশেম। হাশেমের মা খোদেজা যে দয়া মায়া দেখিয়ে ঘাটে বসে থাকা তাহেরাকে আশ্রয় দিয়েছিল সেই খোদেজা যখন জানতে পারে তাহেরা পীর সাহেবের বীবাহিত স্ত্রী তখন তিনি তাহেরাকে আর আশ্রয় দিতে চান না। খোদেজা সমাজকে ভয় পায়। সে পীর সাহেবের 'বদদোয়া' নিতে পারবে না। মায়ের বিরুদ্ধে যেতে চায় হাশেম, সে মাকে জানায়—

হাশেম- আম্মা, আমরা- তো তাঁকে কথা দিয়েছি যে, পীরসাহেবকে তাঁর কথা বলব না। কেন ওসব কথা বলছেন আবার?[৩]

খোদেজা তাহেরাকে আর বাড়িতে রাখতে চায় না। সে জানিয়ে দিতে চায় পীর সাহেবকে। পীর সাহেব যে অনেক কষ্ট পেয়েছেন সেটা তিনি চোখে দেখতে পারছেন না। তাহেরার জন্য পীর সাহেব পানীতে নাকানি চোবানি খেয়েছেন। এবার তিনি দুজনকে মিলিয়ে দিয়ে একটু 'ছওয়াব' পেতে চান। হাশেম এই জিনিসটিকে এত সহজে মেনে নিতে চান না। যে বিষয়ে তাহেরার কোন মত নেই। সেটা তাদের করাই উচিত নয়। হঠাৎ হাশেম রেগে যায়—

হাশেম ।। আর তাঁর বিবির কথার কোনোই মূল্য নাই নাকি ? তিনি মিলতে না চাইলে কীভাবে মেলাবেন? তাছাড়া আমরাই বা মেলাবার কে?[৪]

অন্যদিকে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী ডাক্তার দেখানোর নাম করে ঢাকায় বাল্যবন্ধু আনোয়ারউদ্দিনের বাড়ি আসেন হাতেম আলী। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন বাল্যবন্ধু তার কথা রাখবেন। যে কোন উপায়ে তার টাকার ব্যবস্থা করে তার জমিদারী রক্ষা করবে। সব অঙ্কের যেমন হিসাব মেলে না, তেমনই হাতেম আলীর এই হিসাবও মিললো না। বন্ধু কোন টাকার যোগাড় করে দিতে পারলো না। টাকা না পেলে তিনি জমিদারী রক্ষা করতে পারবেন না এই চিন্তায় উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। অস্থির ভাবে পায়চারী করতে লাগলেন। মানুষ চরানো বহিপীরের বুঝতে অসুবিধা হয়নি হাতেম আলীর কোন সমস্যা হয়েছে। বহিপীর হাতেম আলীর বেদনার কারণ জানতে চায়। হাতেম আলি জানিয়ে দেয় আর এক দিনের মধ্যে টাকা যোগাড় করতে না পারলে তার বহু দিনের জমিদারী শেষ হয়ে যাবে। বহিপীর এত সময় ধরে যেন সুযোগের অপেক্ষায় বসে ছিল। তিনি জানিয়ে দিলেন একটি

শর্তে তিনি টাকা দিতে প্রস্তুত। তাহেরাকে বহিপীরের সঙ্গে যেতে হবে। তাহেরাও এত সহজে দমে যাওয়ার পাত্র নয়। সেও বহিপীরকে শর্ত দিয়ে দেয়—

> তাহেরা ।। পীর সাহেব যা চান তাই হবে। তাঁকে বলুন, আপনাকে টাকা দিলে তাঁর সঙ্গে আমি ফিরে যাব। কিন্তু আগে তাঁকে টাকা দিতে হবে; তারপর আমি যাব।[৫]

তাহেরার এমন শর্তে হাশেম অন্যমনা হয়ে যায়। হাশেম কখনই চায়নি যে তাহেরা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পীরের সঙ্গে যাক। তাঁর বাবাকে সাহায্য করার জন্য তার এই ত্যাগকে সে মেনে নিতে পারে না। তার পিতা হাতেম আলীও জানিয়ে দেয় এমন শর্তে পীর সাহেবের দেওয়া টাকা নিয়ে সে জমিদারী রক্ষা করতে পারবে না। বাবার উক্তিতে হাশেম আরও সাহসী ও দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন হয়ে ওঠে। হাশেম পণ করে নিয়েছে সমস্ত বুজরুকীর হাত থেকে তাহেরাকে বাঁচাবেই। -

> হাশেম ।। (পূর্ববৎ) বুঝতে পারছি, সবার বদান্যতার পরীক্ষা চলছে, বদান্যতার জোরে জান যায় মানুষের; তার নেশায় অন্ধ হয়, বুদ্ধি-বিবেচনার শক্তিও হারায়। আপনি ভুল করবেন না। আপনার সত্যপথ এটা নয়। না, আমাকে নেশায় ধরছে। আপনি জানেন না যে, এঁরা আপনার জীবন নিয়ে খেলা করছেন। আপনি যেন দাবার গুলি, জীবন নিয়ে খেলা করছেন, বুঝতে পারছেন না সে কথা? না, না, আপনাকে আমি বাঁচাবই। (দ্রুতপায়ে তাহেরার পাশে এসে) চলুন আমার সঙ্গে, চলুন আমরা পালাই; এ- বদান্যতা হঠাৎ আপনার কাছে মধুর মতো ঠেকছে; বুঝতে পারছেন না যে, এ বিষ! (হাত ধরে বাইরে দরজার দিকে নিয়ে যেতে যেতে) আপনাকে নিয়ে যাবই। বলে দিলাম, আপনাকে বাঁচাব। আপনাকে বাঁচাবার সময় আমার হয়েছে। এখন আপনাকে আর ছেড়ে দিতে পারি না।[৬]

ধর্মব্যবসায়ী, প্রতারক বহিপীরের হাত থেকে তাহেরাকে রক্ষা করেছে হাশেম। নাট্যকার দেখালেন যে তাহেরাকে রক্ষা করা শুধুমাত্র পীরের কবল থেকে নয় তৎকালীন গ্রামবাংলার কুসংস্কারাচ্ছান্ন প্রথা থেকে। 'মাতৃহারা অসহায় তাহেরাকে এভাবে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে হাশেম পরিণত হয় অস্তিত্ববাদী চরিত্রে।'[৭] আবার 'হাতেম আলীর একদিকে জমিদারী রক্ষা অন্যদিকে তাহেরাকে রক্ষা দুটি বাস্তবতা থেকে সৃষ্ট দ্বন্দ্বে সহায়-সম্পত্তি নয় বরং মানবতারই জয় হয়েছে। তিনি ভণ্ড প্রতারক পীরের হাত থেকে তাহেরাকে রক্ষা করাকেই বেশি গুরুত্ব

দিয়েছেন। হাতেম আলীর কাছে এই মানবতার মূল্য বহিপীরের আত্মোপলব্ধিকে জাগ্রত করেছে।'[৮]

ধর্মব্যবসায়ী নারীলোভী বহিপীরের আত্মোপলবদ্ধি হল জমিদার হাতেম আলীর সাহচর্যে এসে। নিজেকে অন্য আর দশজন সাধারণ মানুষের মত মনে হল তার। মানুষ হিসাবে আবিষ্কার করার পর তার ভাবনা হল—

> বহিপীর - ... সকলে মিলিয়ে আমাকে অমানুষে পরিণত করিয়াছেন। জমিদার সাহেবের উপর সম্পূর্ণ আস্থা ছিল যে তিনি আমার দলে থাকিবেনই, কিন্তু তিনিও আমাকে ঠকাইলেন।[৯]

ভিতরে ভিতরে বহিপীর দুর্বল হতে শুরু করেছে। পীর হিসাবে ধর্মকে অবলম্বন করে সে এতদিন স্বাচ্ছন্দে জীবনকে উপভোগ করেছে। এখন সে নিজেকে পরাজিত মনে করে। তার সমস্ত পরিকল্পনা যেন ভেস্তে যেতে আরম্ভ করেছে। বহিপীর এখন নিজেকে পরাজিত শত্রু মনে করে। নিজের সমস্ত মনের কালিমা ধুয়ে দিয়ে সে সত্যিকারের মানুষ হতে চায়। সে আর কোন শর্ত রাখতে চায় না। সে বিনা শর্তেই টাকা দিতে রাজি আছে। জমিদার হাতেম আলীকে সে জোর করে টাকা দিতে চায়।-

> বহিপীর - ... ইহা আপনাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। মনে করিবেন, ইহা পরাজিত শত্রুর শেষ দাবী। এ দাবী কবুল করিতেই হয়।[১০]

জীবনকে নতুন ভাবনায় ভাবিত করতে চায় হাশেম। তাই সে তাহেরাকে নিয়ে বজরা ছেড়ে চলে যায়। বহিপীর তাদের বাধা দেয় না। সে জানে এই নতুন শক্তির উদ্যমকে সে কোন ভাবেই বাধা দিতে পারবে না। এই গতি রোধ করার ক্ষমতা আজ বহিপীর হারিয়ে ফেলেছে। দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে তাই সে বলতে বাধ্য হয়েছে—

> বহিপীর- এতক্ষণে ঝড় থামিল। তাহারা গিয়াছে, যাক। তাছাড়া তো আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যাইতেছে না। তাহারা তাহাদের নতুন জীবনের পথে যাইতেছে। আমরা কী করিয়া তাহাদের ঠেকাই। আজ না হয় কাল যাইবেই।[১১]

বহিপীরের এই সংলাপের মধ্য দিয়ে 'একদিকে যেমন লক্ষ করা যায় অভিব্যক্তিবাদী প্রকাশ রীতির বিমূর্ত শিল্পরূপ, নাট্যের ছন্দ, তাল ও লয়'[১২] তেমনি লালসালুর 'মজিদের স্রষ্টা ওয়ালী উল্লাহ সৃষ্ট বহিপীরের এই সংলাপের ইতিবাচক দিক আমাদের অভিভূত করে।'[১৩] হাশেমের মা খোদেজা ভয় পেয়ে যায়। পীর সাহেবের স্ত্রীকে নিয়ে চলে যায় তার ছেলে। পীর সাহেবের দেওয়া বদ দোওয়াতে তাদেরকে পড়তে হবে এই আতঙ্কে আতঙ্কিত খোদেজা। খোদেজা ব্যাকুল ভাবে জানতে চায় এবার কি হবে তাদের।

পীরের উত্তর - (হেসে) তওবা তওবা। এত বিচলিত হইবার কী আছে? আমরা সকলে তো রহিলাম। আমরা থাকিব; আপনার জমিদারিও থাকিবে; আমরা আমাদের পুরাতন দুনিয়ার মধ্যে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাকি দিন কাটাইয়া দিব। চিন্তার কী কারণ?[১৪]

নিজের শক্তিতে তাহেরাকে না পাওয়ার জন্য, তিনি আবার পুরাতন দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার কথা বলেছেন। এই সংলাপের মধ্য দিয়ে বহিপীরের নেতিবাচক দিকের কথাই উঠে আসে। নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য জমিদার ও বহিপীর ঐক্য এটাই দেখায় যে , 'প্রগতিশীল শক্তির যখন বিকাশ ঘটে তখন মৌলবাদ ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত মূল্যবোধ নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই এভাবে হয় সংঘবদ্ধ। হাতেম আলী বহিপীরের মিলন তাই সমাজ সত্য, নাট্যকারের সময় ও সমাজ সচেতনতারই রূপক।'[১৫]

মাত্রাতিরিক্ত ধর্মনিষ্ঠ হন পীর সাহেবরা। তাদের জোব্বার সম্মান আছে। পৃথিবীর কোন বদদোয়া তার গায়ে লাগে না। পীরদরবেশদের এই বিশ্বাসে আঘাত হেনেছেন সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ। বহিপীর সম্পর্কে সমালোচক সুকুমার বিশ্বাসের অভিমত হল—'বিচিত্র প্রবণতার সমবায়ে নির্মিত বহিপীর চরিত্র এ নাটকের নানা কৌণিক চরিত্র, একদিকে সে যেমন আমাদের বিদ্রূপের পাত্র, ঠিক তেমনি বিশেষকালের পরিপ্রেক্ষিতে এবং উদারতায় সে যথার্থভাবে সামন্ত জীবনচর্চা ও মূল্যবোধকে প্রতিনিধিত্ব করে। বহিপীর চরিত্রে বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ়তা এবং চরিত্র বিশ্লেষণী ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। প্রথমাবধি হাশেম আলীর প্রতি বহিপীরের সন্দেহ অযথার্থ নয়। পক্ষান্তরে নাটকের শেষাংশে তাহেরা চরিত্রের অন্তর্নিহিত উদারতাকেও সে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল।'[১৬]নাটকটিতে সামন্তসমাজের তুলনায় ধনবাদী সমাজের উদারতা ও মানবিকতা উঠে এসেছে হাশেম আলি ও তাহেরা চরিত্রের মাধ্যমে। সর্বপরি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে এই দুটি চরিত্রের মাধ্যমে। বহিপীর নাটকে ছয়টি চরিত্রের মাধ্যমে বিশেষ একটি কালের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শ্রেণি ও নবোত্থিত পুঁজিবাদী শ্রেণির সংঘাত উঠে এসেছে।

তথ্যসূত্র :

১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, নাটকসমগ্র, প্রতীক, বাংলাদেশ, জুলাই ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৭
২. তদেব, পৃষ্ঠা- ২২
৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ১২
৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ১২
৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২

৬. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৪
৭. রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, থিয়েটার পত্রিকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা , ১৩২
৮. হোসনে আরা জলী, নাট্য বিষয়ক কতিপয় প্রবন্ধ, অনিন্দ্য প্রকাশ, বাংলাদেশ, বইমেলা ২০১২, পৃষ্ঠা, ৫৭
৯. প্রাগুক্ত, সূত্র, ১, পৃষ্ঠা- ৩৫
১০. প্রাগুক্ত, সূত্র, ১, পৃষ্ঠা- ৩৪
১১. প্রাগুক্ত, সূত্র, ১, পৃষ্ঠা- ৩৫
১২. প্রাগুক্ত, সূত্র, ৭, পৃষ্ঠা- ১৩২
১৩. প্রাগুক্ত, সূত্র, ৮, পৃষ্ঠা- ৫৮
১৪. প্রাগুক্ত, সূত্র , ১, পৃষ্ঠা- ৩৫
১৫. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ: জীবন দর্শন ও সাহিত্য কর্ম, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ১৬৪
১৬. সুকুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা- ২২৮

Bengal's Day of Challenge, Persistence and Sacrifice: A brief Historical Study

Ajanta Biswas*

In 1898 George Nathaniel Curzon was appointed the Governor General and Viceroy of India. However, he left India in much discomfiture in 1905, after a tumultuous vocation in India. Understandably Curzon was apprehensive about the judgement of posterity. Walter Lawrence, his private secretary in India maintained the opinion that Curzon was 'always thinking about the verdicts' historians would deliver on him'.[1] While some believed he was one of the greatest British governors who equated empire with service, others hinted that he was an egoist whose entire life was a study that ended in a fiasco. However, late Professor Sarvepalli Gopal's comment has been widely accepted that the greatest of Curzon's achievements, while in India, was the transformation of a mild, nationalist feeling into a bitter revolutionary movement.[2] Admittedly Curzon was not single-handedly responsible for the Partition. There was a protracted political and administrative run-up to most defining event in the history of the British rule in India. Officials like H.H. Risley predicted that a divided Bengal would deal a heavy blow to 'composite Bengali nationalism'. Curzon had no reason to disagree. He had already said that his ambition was to lead the Congress to a peaceful demise. He therefore grossly underrated its probable fallout. He predicted that the outcry would be loud and fierce in the capital.[3] What neither Curzon nor his advisors anticipated was its tremendous political backlash. The anti-Partition agitation soon assumed massive proportions and effectively changed the character, temper and course of the

*Assistant Professor, Dept of History, Rabindra Bharati University.

nationalist movement in the coming decades of the British rule in India.

The anti-Partition movement initially began in Bengal, but it did not remain confined to Bengal Presidency. The Swadeshi movement along with its underlying economic critique of the British rule in India soon found some of its most ardent supporters in Madras, Maharashtra, Punjab, United Provinces and in the Madras Presidency.[4] Among the younger generation of nationalists it had a particularly catalytic impact. The intrinsic faith in the British rule as proclaimed by Rammohan Roy and which survived, despite occasional strains, till the day of Naoroji and nationalists of his ilk, now came under serious doubt. No longer confined to the upper class nationalists of the early Congress, a new genre of popular writings, mostly in vernacular languages carried the message of the Swadeshi movement to the level of ordinary reading public. Some of them were more than mere publicists and their analysis went beyond the confines of piecemeal attacks on the Raj. Armed with facts and figures, they vividly highlighted the plight of the artisans and peasants and, in the process, made piercing criticism of the economic policy of the British rule in India. It is quite known that 'Bangabhanga' or 'Bengal divide' was one of the decisive events in the history of anti-imperialist struggle in India. Equally commonplace is the knowledge that it was a political decision wrapped in administrative interest.

By the late 19th Century, a group of colonial bureaucrats felt the division of Bengal to be necessary in the interest of good government over the subject people guided with the spirit of imperialism. To curb the political-intellectual growth of the Hindu Bhadralok, and weaken the Calcutta-centric support base of the nationalist movement, some Whiteman bureaucrats designed to adopt the policy of dividing Bengal into two parts. However the plan was finally implemented after many waves of discussions and interpretation on it.

Initially, on his arrival at India, Lord Curzon saw only the administrative rational behind the Bengal divide policy, but soon in 1904, during his official visit to the eastern region of the delta, its political urgency especially pressed on him. In the month of February he travelled to Chittagong, then moved to Dacca and lastly Mymensingh. In each district he advocated for the division of Bengal Province with the claim that the native criticisms against the divide policy were fruits either of grudge or ignorance. If we analyze his speeches, we can see that the speech given in Dacca was politically much more instructive than the two others. He claimed himself to be a student of History and maintained, demagogically, that once Dacca was the capital of Bengal but it had lost its importance with the passage of time, and that only the proposed division could help Dacca flourish again. He projected Dacca's elevated status as the (would-be) administrative centre of the proposed province of Eastern Bengal. In that case, the Mussalmans of eastern Bengal could restore the sense of communal integrity that had waned since the demise of the traditional Mussalman-raj.[5] This last proposition quite exposes Curzon. Despite the constant allegiance to administrative facilitation, what he really coveted from this time was no less than a communal enmity between the Hindus and Muslims. This crafty Englishman tried to plant the idea that the Mussalmans from the East were undermined as if by the Hindus from the West, that Dacca had been withering proportionally with the rise of Calcutta. This is called communal secessionism, which motivated the decision of Bengal divide.

Far from its official purpose of running a survey on the public opinion, the tour was designed in order to gauge the possible reaction of the people of the Eastern Bengal to the policy. Curzon was rather relieved to note that there was already an undercurrent of communal tension in Dacca, he made it a point to accelerate it, while there was no lack of bureaucrats like Risley, who, in a manner quite suited to Lord Curzon's eminent home

secretary, indefatigably fuelled the master's vicious intention. Their collective strife resulted in the verdict of Brodrick, the Secretary of State, who, in 9th June 1905, passed the bill of Bengal divide.[6] After the announcement of it, in 7th August, a huge convention was held in protest at the town hall. The autobiography of Surendranath Banerjee gives a detail description of this protest. [7]

The countdown started. The date of implementation, 16th October of 1905, had been pre-declared by Curzon. The numerous protests that ensued are abundant in contemporary periodicals and newspaper reports. The accounts mostly accord with one another. However, the minute chronicle of the events of the first day, i.e. the day of implementation, was given in a secret report by Calcutta's the then police commissioner. In this report, three events has been distinctly marked aside – a) *Gangasnan* (holy bath in Ganges) in early morning and *Rakshabandhan* (tie up a string in the name and sake of brotherhood), b) spontaneous closing down of the Calcutta Bazar, c) laying the stone foundation of Federation hall upon the two acres of land at 298, Upper Circular road. A detailed recapitulation of the alleged events would be worthwhile.

The day started with holy bath in the Ganges. Rakshabandhan was to follow. The idea of rakshabandhan was proposed by Rabindranath Tagore. The oath (to wear "rakhi" on that day as a token of political fraternity among the subjects) was taken beforehand. The biographer of Rabindranath assumes that on 27th September, Tagore was present as secretary in a special meeting of Swadharma Sadhan Samity held in Savitri library at Akrur Dutt lane, from where the call of rakshbandhan was given and finalised. Rabindranath wrote *Rakhisangeet* (a song dedicated to rakshabandhan). A warm description of rakshabandhan can be found in Abanindranath Tagore's memoire 'Gharoa'. He writes, "we all tied rakhi to each other. Others who stood nearby were also made part of the

celebration. Nobody, not even little boys and girls, was spared; whoever was available at hand was tied rakhi then and there. At the *ghats* (paved staircases) of Ganges, it became nearly a phenomenon**.** We were coming by Pathureghtata, saw a few chauffeurs occupied with the horses in the stable of Biru Mallick, suddenly Rabikaka turned about to wear them rakhi. I took alarm. Why did Rabi uncle do this! They are Mussalmans, he tied rakhi to Mussalmans — a fight is to issue any moment. But [to my astonishment], what fight? [Nothing of the sort happened.] He was even embracing them after tying rakhi. The chauffeurs, in the meantime, were taken aback**."**[8]

As his evident from the passage cited above, Rabindranath, like others, joined in the jubilation of that day. Otherwise, such a public display of emotion was not in his nature. He himself wrote, "[We] used to tie rakhi to whoever came by, even to the government's police and constables**.** An incident comes to mind: once a constable, with his palms together, begged for mercy, 'pardon me sire, I'm a Mussalman'."[9]

It is difficult to ignore the unease that underlines the uttering. Overwhelmed as people were with the outburst of emotion, only a few realized its internal tension. That a large section of the Bengali Muslims would keep off from the movement was not apparent at that time, but became evident later.

Though the police commissioner, in his report, has explained away the shut-down of the market with allegiance to force, Ramendrasundar Tribedi, in one of his writings, offers a different explication. According to the latter, the day was consecrated to *Arandhan* (a ritual refrain from cooking). No shops were opened in the city since everyday vending had been suspended. As men from the mofussils preferred to stay at home then to come to Kolkata, the supply fell. There was no need to apply force to make successful this virtual strike. The industrial mills in Calcutta and its surrounding suburbs were closed as well. The day made an occasion for mourning on the one hand, and of oath-taking on the other.

In connection to the laying of foundation of the Federation Hall, the police commissioner had given a long list to the government, of respectable persons who were present at the site. He also mentions that after the particular event (i.e. laying of the stone), the gathered students walked to Bagbazar, and met again at the residence of Pashupatinath Basu. In this procession Rabindranath was also present. At that evening, a huge mass assembled at Sri Basu's house. A plea was made to form a National Fund, to which many responded. A special mention has been given in the police report to the presences of Mr. Ratcliff and Mr. Roberts, who were, respectively, the editor of The Statesman and the journalist of the same. Moreover, the police commissioner wrote that Roberts might have joined actively in the raising of the fund. Allegedly, a sum of about twenty thousand rupees was collected on the evening for the national fund. The report also speaks of the workers' strike in Rally Brothers' jute mill on the very same day. His writing shows that since this day the song 'Bande Mataram' was elevated almost to the status of national hymn. The officer wrote, "For the students, whenever they passed a European... bawled Bande Mataram as close as they dared and in a provocative way."[10]

The first day, 16th October went in that way. The intensity of the protest suggests that it did not result from the empty war-cry of the politicians of Calcutta, but was possible only by engaging the active support of the greater civil society. The sphere of politics had been narrow so far, suddenly it was extended. And this brought a qualitative change to politics. Till the date, the political movements were majorly city-centric. Now it had become instructive that the protest might get a start in the city, but the peoples from the country are surely to join it. The convention at Town hall erased the gap between the country and the city. Thus this event added a new dimension in the history of protest movements in the sub-continent.

** I am indebted to my teacher Late Prof. Basudeb Chattopadhyay, Professor of Dept of History, University of Calcutta in writing the earlier draft of this article.

Notes & References

1) Cited in David Gilmour, *Curzon*, London, 1995, p. xi
2) Sarvepalli Gopal, *British Policy in India 1858-1905*, Cambridge, 1965
3) Quoted in David Gilmour, op. cit. p.473
4) The Intelligence Branch officials of the Bengal police prepared a confidential report on the "Effect of the Anti-Partition Agitation On Provinces Other Than Bengal". This report, dated 26 January 1906 was drafted by C. J. Stevenson- Moore, Inspector General of Police, Lower Provinces and F. C. Daly, Special Assistant to the Inspector General of Police. This is the earliest police report of its kind, indicating the spatial expansion of the Swadeshi Movement outside Bengal. It is now available in West Bengal State Archives.
5) Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908*, New Delhi, 1973, p. 18
6) Ibid, p.11
7) Surendranath Bandyopadhyay, *Jati Jedin Gothoner Pothe*,(tr. B. Das), Indian Association, Calcutta, 1977, p. 308-10
8) Abanindra Rachanaboli, Prathom Khando, Prokash Bhavan August 2010, Panchom prokash p. 70
9) Above mentioned lines in this article are loosely translated by Smt Sambida Lahiri , PhD scholar , University of Calcutta.
10) Report on the Agitation against the Partition of Bengal (Bengal Govt. No 205, P. 25th January 1906) para 57 Home Political Proceeding 'A', June 1906 No 175; Sumit Sarkar op.cit. p. 203

A Comparative Assessment on ICT Accessibility among the Government and Non-Government Higher Secondary School Students in Bilaspur District, Chhattisgarh, India

Nirmal Kumar Guchhait*

&

Payel Banerjee**

ABSTRACT

ICT is an acronymic formof Information and Communication Technology. Teacher Education& students' capacity can be achieved easily by using techniques, teaching aids,like ICT components.**ICTs: Computers, internet, mobiles, etc. Those are can be called as audio-visual media and these are very important in teaching learning process.**The objectives are framed to compare the ICT resources available at schools among the govt. and non-govt. higher secondary school students & to compare the ICT Usage at schools among the govt. and non-govt. higher secondary school students and to compare the access of ICT activities collectively among the govt. and non-govt. higher secondary school students. There is survey method used to collect data by using self-made Questionnaires tool (total 55 questions). There are total 250 samples are used from govt. (125) and non-govt. (125) higher sec. school students

*Dissertation Scholar,Department of Education,Guru Ghasidas Vishwavidyalaya,Bilaspur(C.G),India

**Assistant Professor,Department of Education,Guru Ghasidas Vishwavidyalaya,Bilaspur(C.G),India

of class XI from 14 schools in Bilaspur district, Chhattisgarh.The data analyses for this study utilized Microsoft Excel & t- Test was used to find the response to the questionnaire. Findings: There is more ICT resources are available in non-govt. schools than the higher secondary govt. schools. From the above discussion, the researcher concluded that there are less computer, internet, projector available in the govt. higher secondary schools than non-govt. higher secondary schools. Implications: By envisaging the provision for computer education (ICT) in the government schools as well as non- government schools in students' curriculum to improve quality. This paper suggested that a study can be conducted considering various aspects of Computer subject teachers e.g., training, courses etc programmes.

Keywords: ICT, ICT accessibility in Govt. & Non-govt. School Students,Comparative assessment, Implications, Suggestions for improving quality.

INTRODUCTION

Education itself is the basic human right & as a tool to make a sensitive about issues & problems in our lives. It is considered to be the backbone of national ideals.Education is the most powerful instrument for changing in developing and developed countries. It provides a better quality of life for any citizen for their living environment. The purpose of Education is not only to train people for employment & train them to competent their lives for present & future...so called preparation for future life. Teacher Education & students' capacity can be achieved easily by using techniques, teaching aids, like ICT components. **ICTs: Computers, internet, mobiles, etc.** ICT is an acronymic form of Information and Communication Technology. ICT refers to forms of technologies that are used to create, store, share or transmit, exchange information (UNESCO, 2002). The overall

purpose of this study was to compare the accessibility of ICT based instructions by secondary school students in govt. and non-govt. of Bilaspur district in Chhattisgarh. This paper suggested that a study can be conducted considering various aspects of Computer subject teachers e.g., training, courses etc programmes.The advantages of ICTs are-

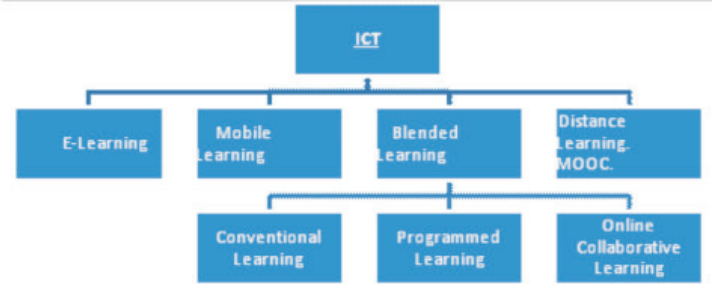

§ Increase retention,

§ Self Pacing of Learning and Serve multiple teaching functions,

§ Capture expert knowledge and Multiplicity of Languages.

RATIONALES

Computer Education has become a compulsory subject in Teacher Education and both teachers and students started using computers in educational process. The rapid diffusion of Information And Communication Technologies(ICT) during the last two decades has had effective impact on all the area of human efforts.ICT are seen as having a great potential for improving the human condition by creating new economic and educational opportunities. During the use of computers in education at the time of learning, it is observed that both from the context of facilities, awareness, skills, applications and evaluation the students always felt sensitive in integrating the computer education. Hence researcher felt that to know the access of ICT of students on educational purposes, which is taken as for the study.

Reviews of Related Literature

The scope of knowledge is very vast and progressive. Before undertaking a new research we must have knowledge of the related studies. In order to achieve this, it is very important to study and analyses the previous researches. It gives an idea of how much work has been done on a problem which the research had undertaken, the methodology adopted and the findings of the previous researches. A review of related literature also reduces the chances of a repetitive study. It helps to propose an outline and provides the guidelines to carry out the study.

! Suryawanshia and Nakhede (2015) conducted a study on "Green ICT for sustainable development: A Higher Education Perspective" that evolution of Green ICT(GICT) and discusses the barriers in implementation of GICT at higher education institutions based on survey concluded in INDIA.

· An expensive literature review pertaining to GICT and sustainable development was carried out and 10 barriers were summarized using SPSS tool and Wilcox on Test the most important barrier for successful implementation of GICT at H. Education has been discovered.

! Buadeng, Andoh, Y.Issifu(2014) conducted a study on 'Implementation of ICT in Learning: A study of students in Ghanaian secondary schools' that to investigate secondary school students' use of ICT and the factors that relate to their technology use. A total of 3380 students from 24 public and private schools from four regions in Ghana participated in this study.

· This study found that majority of the students used ICT to communicate with peers more than other types of ICT application. However, the study found that students' pedagogical use of ICT was low. This analysis showed-student in public schools pedagogically uses ICT more than private schools. Total 3380 respondents, 51.5%females & 48.5% males. In addition,

urban school students pedagogically use ICT more than semi-urban and rural school students. Finally, the findings indicated that students' ICT competencies were the most predictor of their technology use.

! Duta, Martinez and Rivera (2014) conducted on 'between theory and Practice: the importance of ICT in higher Education as a tool for collaborative learning' that the importance of ICT in classroom by using virtual platforms (Blogs, Twitter, Trello, E-mail, Discussion forums). They used descriptive case method &collected data from 90 undergraduate students in each group aged between 18 and 28 years in university in Romania.

· Their findings indicated as below!

a. Tool for communication& interaction! 91%,82 respondents.

b. Improves learning!87.7%,79 respondents;

c. Facilitates the autonomous& independent learning!80%,72 respondents ;

d. Assume different roles(taste, hobby, interest)!75%,68 respondents ;

e. Fosters knowledge of the contents of the field!63.35, 57 respondents ;

f. Increased motivation!58%,52 respondents ;

g. Follow-up!46%,41 respondents ;

h. Achievement of the time!43%,39 respondents ;

i. Innovation& integration!39%,35 respondents ;

j. Developing skills in finding the information!34%,31 respondents ;

k. Creativity!31%,28 respondents ;

· Other answers! here those responses that could not be integrated into any of the above categories. They proved that the use of ICT influences the students' achievement at top level.

Knowledge Gap

After reviews, the researcher got there is no detail activity (research) among the govt. And non-govt. higher secondary school students in State and CBSE secondary schools in Bilaspur district were found. So that is a knowledge gap, which is seemed to me.

Research Question (?)

After studying the related reviews on use of ICT, a question arises in researcher's mind, is there any comparison between the accesses of ICT among the govt. And non-govt. higher secondary school students in State and CBSE secondary schools in Bilaspur district?.....

Statement of the Problem

Considering the importance of ICT in teaching learning process the present study is based on what is the condition of accessing ICT govt. & non-govt secondary school students in today's scenario. The present study focused on "**A Comparative Assessment on ICT Accessibility among the Government and Non-Government Higher Secondary School Students in Bilaspur District, Chhattisgarh, India".**

Objectives of the Study

1. To compare the ICT resources available at schools among govt. and non-govt. higher secondary school students'.

2. To compare the ICT Usages at schools among the govt. and non-govt. higher secondary school students.

3. To compare the access of ICT activities collectively among the govt. and non-govt. higher secondary school students.

Hypotheses

To test the attainability of the above objectives (2, 3,) the following hypotheses are formulated.

A. Research Hypotheses(R_H):-

R_H 1: There is a difference between the ICT Usage at schools among the govt. and non-govt. higher secondary school students.

R_H 2: There is a difference between the **access of ICT activities collectively among the** govt. and non-govt. higher secondary school students.

B. Null Hypotheses(H0):-

$H_0$1: There is a no significant difference between the ICT Usage at schools among the govt. and non-govt. higher secondary school students.

$H_0$2: There is a no significant difference between the **access of ICT activities collectively among the** govt. and non-govt. higher secondary school students.

Variables

a. Independent: Higher secondary schools (govt. and non govt.).

b. dependent: The ICT accessibility of students.

Research Process

According to objectives, survey method was adopted for the study.

Survey method: Survey method is used to obtain descriptive information about target population.

Population: All higher Secondary School Students of Class 11th (Arts, Science, & Commerce) who were learning with secondary schools those are situated in Bilaspur District.

Samples: 250 Students (125from govt. and 125 from non-govt.) were selected for the study from 14 schools of Bilha block of Bilaspur District of Chhattisgarh state, by using simple random sampling method. Detailed of sampling provide in Appendix No.I.

APPENDIX-I

DESCRIPTION OF SAMPLES

Management	School Name	Sample Size
Govt. Schools	A. Govt. HS School, Koni	125
	B. C.G HS School, Birkona	(Students,
	C. Govt.HS School, Tarbahar	Class-11th)
	D. Dr.B.R.Ambedkar N.N School,Magarpara	
	E. Govt. HS School,Chantidih	
	F. Mission HS School, Brihaspati Bazar	
	G. C.G HS School, Police Ground.	
Non-Govt. Schools	H. Modern Educational Academy, Seepat Chak,	125 (Students,
	I. Burgess EM H School,Police Line,	Class-11th)
	J. Real Growth P.School,Uslapur	
	K. St.Joseph Convent HS School,Tarbahar	
	L. Hari Model School,Bilaspur	
	M. Saraswati S.Mandir HS ,Koni	
	N. Mohanty E.M HS School,Bilaspur.	
Total Schools	14	250

Research Tools

The instruments that are employed to gather new facts or to explore new fields are called as 'Tools'. It is has vital importance to collect suitable and desired data. Different tools are suitable for selecting different types of data. Since the present study is related to the collection of information from the Students regarding

the use of ICT in Learning Process in higher Secondary Schools. A 'Questionnaire' was constructed by researcher and administered to find out the desired objectives.

Also Checklist (Yes/No) type and Observation Schedule are included in the Questionnaire Tool. Microsoft Excel is used for data calculation.

Data Analysis

Here t-test is used to find out the statistical significance.

From objective 1: The researcher got that this objective is studied under the qualitative analysis of data for each question. From the survey it is noticed that at minimum one computer available in every school. There are 3 schools (2 govt. and 1 non- govt.) have at least 1 projector only among 14 schools. There are 4 schools (2 govt. and 2 non-govt.) have internet facility only. There are 13 schools have Computer labs except 1 govt. school and also 1 non-govt. school has virtual learning platform among 14 schools.

From the above discussion, the Researcher concluded that there arefewer computers, C.D. Cassette, internet, projector available in the govt. higher secondary schools than non-govt. higher secondary schools.

From objective 2:

Table-1.1

t-Test :Two-sample assuming equal variances..

Fig: t-Test.

From objective 2, researcher got that here in table no, 1.1, df 248 and the significance level 0.05,"t" calculated value is 12.975.

This is greater than "t"-table value which is 1.969.

So this indicates that our formulated Null Hypothesis ($H_0$1) is rejected and alternate hypothesis (Research hypothesis) is accepted at df 248 and Significance level 0.05.

Hence, can draw the interpretation as- There is a significant difference between ICT usage at schools of the govt. and non-govt. higher secondary school students.

From objective 3:

Table 1.2: t-test: Two-sample assuming equal variances

From objective 3, researcher got that here in table no, 1.2, df 248 and the significance level 0.05,"t" calculated value is 14.603 .

This is greater than "t"-table value which is 1.969 .

So this indicates that our formulated Null Hypothesis ($H_0$5) is rejected and alternate hypothesis (Research hypothesis, R_H 5) is accepted at df 248 and Significance level 0.05.

Hence, can draw the interpretation as- There is a significant difference between the govt. and non-govt. secondary school students with reference to the ICT Activities.

FINDINGS

Findings.1: There is more ICT resources are available in non-govt. schools than the higher secondary govt. schools.

Findings.2: It can be concluded that the students of non-govt. schools had a better level of ICT usages than the students of govt. schools.

Findings.3: In this objective research, explore that there is a significant difference between **the access of ICT activities collectively among the** govt. and non-govt. higher secondary school students. For this study researcher used t-test to analyse the significance level of compare **the access of ICT activities collectively among the** govt. and non-govt. secondary school students.

It can be concluded that the students of non-govt. schools had a better level of **the access of ICT activities collectively**than the students of govt. schools.

DELIMITATIONS

The study was limited to Bilha block of Bilaspur district of Chhattisgarh state in India.

The study was limited to some Rural and some Urban schools only.

The study was limited to Class-11th only.

CONCLUSION

From the above discussion, the Researcher concluded that there are less computer, internet, projector available in the govt. higher secondary schools than non-govt. higher secondary schools.

It can be concluded that the students of non-govt. schools had a better level of ICT usages than the students of govt. schools.

There is more ICT resources are available in non-govt. schools than the higher secondary govt. schools.

- **Needs of the Study:** ICT are seen as having a great potential for improving the human condition by creating new economic and educational opportunities, so this study is important for modern situation in the world.

IMPLICATIONS

a) By envisaging the provision for computer education in the government schools as well as non- government schools in students' curriculum.

b) To develop students' competencies to solve daily problems by using ICTs.

c) To increase the computer literacy (CLASS project) in rural area students as well as urban area in the higher secondary level.

SUGGESTIONS FOR THE STUDY

Based on the findings of the study, series of recommendations were formulated. First, this study should be

replicated and a similar study should be conducted using additional board in India.

Further study in Chhattisgarh is required to determine and evaluate barriers, incentives and attitudes of students that could affect the implementation of ICT in the government and non-government higher secondary schools.

A study can be conducted at different college & university levels.

REFERENCES:

1. Aggarwal, Y. P.(1988).*Statistical Method*. New Delhi: Publishers Pvt. Ltd.
2 Best, J.W. and Kahn, J.V. (1965).*Research in Education*. New Delhi: PHI Learning Pvt. Ltd.
3 Buch, S. S.(1983-88). Fourth Survey in Research in Education, Vol. 1.
4 Charles, B.A; Issifu,Y.(2014).Implementation of ICT in learning: A study of students Ghanaian secondary schools. *Procedia-social and behavioral sciences*, 191(2015)1282-1287.
5 C.A. David. (2007). Web Based Learning: Pros, *Cons and Controversial Clinical Medicine* Vol. 7,No 1.
6 Duta, N; & Martinez, O. &Rivera. (2014).Between theory and practice: the importance of ICT in Higher Education as a tool for collaborative learning. *Procedia-Social and Behavioural Sciences,* 180(2015).1466-1473.
7 Garrett, H.E.(1962).*Statistics in Psychology and Education* .Bombay: Allied Pacific McNally Ltd.
8 NCERT.(2013).Information and Communication Technology for School System .Version 1.01.
9 Suryawanshi, K ;Narkhede, S.(2015).Green ICT for sustainable Development: A Higher Education Perspective. *Procedia computer science,* 70(2015).701-707.
10 UNESCO. (2002 a). Information and Communication Technology in Education: A Curriculum for Schools and Programme of Teacher Development, UNESCO, Paris.

From Above the Cloud Line

Aniruddha Sarkar*

Synopsis :

This essay is about the works of the eminent writer Ruskin Bond. In this essays it is discussed how Bond brilliantly uses nature as the backdrop of his works and how nature especially natural surroundings of the hills becomes one with the characters of the stories and sometimes how nature becomes a character of its own. Bond writes fictions as well as non-fictions. He uses his own experiences in the hills to write his works. So we find a vivid picture of nature on the hills from his works.

Keywords : Nature, Hills, Short stories, Ruskin Bond, experiences

Content

The Tribunecalled him “One of the best storytellers of contemporary India”[1] and I couldn’t agree more. Whenever I think of the name Ruskin Bond the pictures of the green hills pop up in my mind. Whenever I read his works, I can feel the chilled air on my skin, can see the winding paths if I close my eyes, can hear the chatter of the busy marketplace or feel the silence of the lonely woodland pathways. The charm of his writing encircles the readers throughout their perusal. He has this magical fairy dust all over his works. Fiction or nonfiction whatever they may be, contain the aroma of his charismatic style.

Bond spent his life almost entirely in the hills. He was born in Kasauli, Himachal Pradesh and grew up mostly in Jamnagar, Dehradun, Shimla and Delhi. And then he finally settled in

*Researcher.

Mussoorie, Uttarakhand. He still lives there with his adopted family. So nature has played a vital role in Bond's life and unsurprisingly in his literary works. Bond has written both fictions and nonfictions. In his career of over 60 years he has over 120 titles in print. He has written more than 500 short stories, several novels, essays, poetry, analogies and children books.

How the mountains have impacted his works is evident in most of his writings. He has written many stories about his life on the hills, nature and the hill people. Some of them are fictions, some are non-fictions. The descriptions are so vivid in those writings that the readers can have an almost realistic experience while reading it. The pictures of the hills he has portrayed in his works are mostly from Dehradun and Mussoorie. There are a number of short stories and non-fictions that have the hills of Dehradun and Mussootie as a background. In his book "Roads to Mussoorie", a collection of his non-fiction works, he has combined his experiences on the roads of the hills. While introducing his book he writes "…in this book I take a backward look at people I've known, and interesting and funny things that have happened to me on the way up to the hills or down from the hills."[2]

In his short story "The Cherry Tree" Bond tells the tale of a boy named Rakesh who lives in the hills with his grandfather. His parents live in a small village near the slopes down the hills where they grow crops. There are no schools nearby that village where Rakesh can go to study, that's why he lives with his grandfather and goes to school in the town. The story begins with the description of the natural surroundings of the hills where Rakesh lives. There are many fruit trees in that area.Rakesh's grandfather is a retired forest ranger who lives in a small cottage on the outskirt of the town. Rakesh walks to his school every day. Oneday on the way back from his school he buyssome cherriesand starts eating them. It is about half an hour walk for him to reach his house. When he reaches home there are only

three cherries left in his hands. He runs to his grandfather, who is working in the garden, and offers him a cherry saying “Have a cherry, Grandfather”[3]. When his grandfather takes one of the cherries, Rakesh immediately eats the other two. While eating the last cherry Rakesh keeps the seed in his mouth a little long and eventually asks his grandfather if a seed of a cherry is lucky. Then his grandfather says that nothing is lucky if one puts it away and never makes use of it. Here we can see the beautiful message Bond is trying to convey through such a simple storyline. As we go through the story we see that Rakesh, with some help of his grandfather plants the seed in a corner of their garden.

When they have almost forgotten about the seed they have planted after a few months, one day Rakesh, while he was in the garden, discovers a sapling in the ground exactly where they have planted the seed. He immediately informs his grandfather and shows him the plant. His grandfather confirms that the plant is indeed a cherry tree plant and tells Rakesh to water it now and then. Rakesh runs to bring a bucket of water and waters it. He even arranges some small pebbles in a circle around the plant to provide some privacy.

Rakesh observes the plant every morning, but doesn’t see much of a change in the growth. He decides to stop looking but for a six-seven year old kid that is not possible. So he looks at the plant every day, though for his own satisfaction he looks at it from the corner of his eyes. The cherry tree grows rapidly in the monsoons. But when the tree is about two feet high a goat enters the garden and eats all the leaves. But after his grandfather’s assurance he keeps up hope that the plant will eventually survive. But another accident happens to the plant. A lady who is cutting the grass accidentally cuts the plant in half. When everyone is thinking that the plant will die now, it somehow survives.

The next year Rakesh becomes eight. He is taller now, and so is the cherry tree. In the monsoon that year he goes to the

village to help his parents with planting,ploughing and sowing. When he comes back he sees that the plant has grown again. It is now the height of his chest. He discovers a small green mantis on the branch, the first visitor of the cherry tree. As the days pass by the tree continues growing. One evening Rakesh and his grandfather are lying underneath the tree and are talking. Rakesh asks his grandfather why do they like the tree so much more than the other trees when there are thousands in the forest. His grandfather replies that the cherry tree is their favorite because they have planted the tree by their own hands. It istheir own creation. Rakeshwonders if that is what it feels to be God.

Another story by Bond where we see the landscapes of a hill town is “The Blue Umbrella”. It is a story of a young girl named Binya, short for Binyadevi who lives in a small village on a hill. The story is about how one day she comes across a beautiful blue umbrella while looking for their cow Neelu. She was walking through the roads and the meadows looking for her cow when she meets some of the townspeople who have come to the meadow to have a picnic. They have a beautiful blue umbrella. Binya has never seen such a beautiful umbrella. She has fallen in love with the umbrella the moment she has seen it. So she treads her tiger’s claw lucky charm pendant for the umbrella.When she returns to her village it appears that everyone in the village wants to have that umbrella. The story tells how Binya likes to have the umbrella open all the time. The story goes on and we see how one day a shopkeeper tries to steal the umbrella and how Binya’s brother Bijju stops him from doing that. It is a simple story of a village girl, her blue umbrella and her brother with the hills as the backdrop. The hills, the hill roads and the hill climate play really important roles in this story.

The story called “The Fight” has a description of a forest in the hills. It presents a vivid picture of a pool in the forest, a stream that feeds the pool and the surroundings of the pool. “The Fight” depicts the story of a boy, Ranji, whose family has just moved in

a town the hills named Rajpurand his journey to explore the new place. As he has been there for not more than just a month, he has not made any new friend. He just wanders around the place, mostly in the forest. Thus one day he discovers a pool amidst the forest and decides to swim in it one day. One such day while he is swimming in the pool he meets another young boy named Suraj who claims to be the owner of the pool. After some arguments they start to fight. They fight for about five minutes and when they see that they both have equal strength and there is no chance for any one of them to win the fight they decide to meet the next day and continue the fight. But when they meet thenext day they eventually become friends. The whole story has the forest and the village near the forest as the background.

Bond has written lots of stories that not only have the hills as the backdrop but also having paranormal activities in them. One of such stories is “A Face in the Dark”. It is a story about a teacher Mr. Oliver who teaches in a school in Shimla. This story describes the beauty of the hill roads at night, the beautiful deodar trees and the beauty of the outskirts of the hill station of Shimla. The story eventually leads to the paranormal incident that the teacher Mr. Oliver experiences towards the end of the story.

Another story named “The Tunnel” has the picture of the jungles of a small village of Dehradun and the rail-road that has a tunnel over it. The story is about Suraj, a young boy who “had cycled out of Dehra and taken the jungle path until he had come to a small village.”[4] He goes there to see the train pass through the tunnel. As the story progresses we see how one day he meets the watchman of the tunnel and gets an invite from him to stay at his house for a night to see the night train passing through the tunnel. He accepts his invitation gladly and stays one night and experiences the night life of a watchman of a tunnel. We get to experience the same with the help of Bond’s sheer expertise of describing nature and the situations.

Ruskin Bond has writtennot only fictions but also lots of non-fiction works which are mostly based on his life in the hills of Dehradun and Mussoorie. One of such books by him is “Roads to Mussoorie”. In this book he has written about several incidents that he has experienced on the roads of Mussoorie and other nearby hill stations.

Bond really likes to be close to nature. It is evident in his choice of subjects and the background he chooses for his writings. The thing that is really great about Bond is that, whenever he reminisces about his life and his experiences he only talks about the good staff. He himself writes in his book that when a person reaches his reasonable age, in his case the age of sixty, he has collected a few pleasant memories. Though he must have collected some unpleasant memories as well, according to Bond, the unpleasant memories can easily be ignored. He says that the psychiatrists might not agree with his view and they might want their patients to unburden their childhood traumas. Then again if someone is able to escape their childhood traumas he will never have to go see a psychiatrist. He writes “The nice thing about reaching a reasonable age (sixty plus) is that, along the way, one has collected a few pleasant memories. Life isn’t always pleasant, but I find it possible to shut out the darker recollections and dwell instead on life’s happier moments.”[5] This is why we always find his writings so refreshing and full of life and full of nature.

References:

1. The Tribune.
2. Backward, Roads to Mussoorie by Ruskin Bond,Rupa Publication, Page – IX
3. The Cherry Tree, The Writer on the Hill by Ruskin Bond, Rupa Publication, Page – 82
4. The Tunnel, The Writer on the Hill by Ruskin Bond, Rupa Publication, Page – 65
5. Landour Days by Ryskin Bond, Penguin Books, Page – 7-8

West Bengali Muslims Gaved For Partition

Chandrabali Das*

Abstract

In undivided Bengal, the Hindus and Muslims coexisted despite the core value differences between Islam and Hinduism. The textual or doctrinal Islam, embodied in the Arabian, Persian and Urdu languages proved totally alien to the common Muslim masses who spoke nothing but Bengali language. Keeping in view these facts, the question arises – why and how the Muslims of Bengal developed an identity separate from that of the Bengali Hindus and craved for a separate state. This chapter makes a humble attempt to analyse the root causes of the crave of the Bengali Muslim Community for a separate identity and ultimately a separate state. In this chapter emphasis will be laid upon the educational, economic and socio-political backwardness of the Muslims as primarily responsible for their alienation from the Hindu society. It was their backwardness in the sphere of economy, politics and education that invited a pan-Islamic trend which further encouraged them to crave for a separate state, free from the domination of the Hindus.

Content

In undivided Bengal the Hindus and Muslims used to remain united for a long time till the advent of the British East India Company, despite the core value differences between Islam and Hinduism. But with the advent of East India Company in India, the relation between the Hindus and Muslims underwent remarkable changes. Certain policies of the British India Government acted as catalysts in effecting this change.

*Asst. Professor, Dept. of Political Science, Kidderpore College.

The Educational Backwardness of Muslims in Bengal

The British rulers introduced formidable changes in the Indian Society and administration, introducing new attitudes in the British officials. What prompted the British rulers to introduce this change? The urge for this change came from two factors – 1) thee need for public servants with a knowledge of the English Language and 2) the influence in favour of both English and Vernacular education which was exercised by the missionaries in the early years of the 17th Century.[1] So the British rulers felt the need of implementing the policy of imparting western knowledge in English to the ordinary Indian masses to build up a class of Indians best suited to their administrative demands. This policy produced entirely different effects on the two major communities the Hindus and the Muslims. The Hindus welcomed this new policy and quickly adjusted themselves to the new system as the advent of the Britishers and the introduction of new administrative and political order was just a natural impact resulting from the change of rulers. But the Muslims found it difficult to accept the change because they couldnot digest the reality that they were dethrowned and in their place a new set of rulers arrived.

The new English education system introduced by the British rulers was readily accepted by the Hindus. But the Muslims felt humiliated to see that the prestige and esteem that they enjoyed as rulers was now enjoyed by someone else. So, they could not accept the Western English education readily like the Hindus. On the other hand the elimination of support of princely patronage and of the officials and zamindars the traditional educational system of Muslims declined. When English became the official languages instead of Persian, the Hindus remained unaffected but it was a great blow to the Muslims.

The latter showed apathy towards English education but at the same time due to decline in their traditional religious education

fell far behind the Bengali Hindus as far as educational development was concerned. The Indian Education Commission was appointed on 3rd February 1882 under the chairmanship of W. W. Hunter, member of the Viceroy's Legislative Council to examine the educational progress of the Muslims.[2] In its report the commission drew attention to several factors which appeared to handicap the Muslim student in Bengal. In its report the commission noted that a Muslim family attached priority to religious teaching in a mosque. After receiving religious education a Muslim boy could enter mainstream school education. This implied that a Muslim boy got admitted to school much later than a Hindu boy. So when the Hindu boy became already proficient in English, Maths and Science a Muslim boy lagged far behind so far as these non-religious subjects were concerned.

Secondly the commission noted that the Muslim parents were usually poorer than the Hindu parents of a corresponding social status. So even if the Muslim parents got their child admitted in school, due to inadequate monetary resources, they could not afford to keep their child in school for the completion of his education.

Thirdly the Muslim parents preferred to give such an education to their child which would enable him to secure a high and prestigious place among the learned members of the Muslim community. Naturally the education which would enable the child to compete for offices or enter modern professions did not receive enough encouragement. So when a Bengali Hindu boy devoted his learning time to English, Science and Mathematics, a Bengali Muslim boy devoted the same time to learning the Arabic, Persian and Theology of Islam in the Madrasah. Hence, from the very beginning of his educational career, a Muslim student studied under disadvantages which prevented him from competing with his Hindu neighbor on equal terms.

When the Education Commission was presenting its observations, in Bengal the scenario of education was like this – at that time education was provided at three levels – the primary school, the secondary school and the university and in two ways – by the Government and the Private institutions. Some special schools were operating to meet the educational needs of the Muslim students namely Quran Schools, Maktabs, Junior, Middle and Senior Madrassas[3] of these, the first two provided primary education, the next two secondary and the last higher education. The Muslim Bengali children received their primary education in the Maktabs and Quran School. But in these schools all that was taught was the recitation of the Quran and the teacher who was appointed known as Mianji was largely an ignorant person who only knew Arabic alphabets and characters. Those schools naturally lacked in secular education values.

The government of Bengal had always presumed that as the Muslim masses in Bengal spoke a unique Bengali language with a little admixture of Arabic and Persian words, the ordinary primary schools teaching in Bengali would be quite enough for Bengali Muslim children if at all any need for a special school might arise, the Mianjis of the Maktabs could be persuaded to teach a little arithmetic, Bengali etc. so as to qualify the Maktabs for Government grants, as per the rules of the primary education system. But very close surveys of these maktabs revealed that whatever the poor class might speak, they wished Urdu to be the medium of instruction in their schools. The lower class Bengali Muslim always wanted to emulate the upper class Muslims by learning to speak Urdu. So they preferred Urdu to Bengali and this trend was observed among the Mianjis of Maktabs as well.

All efforts by the Government of Bengal to evolve a special course for the maktabs by persuading the Mianjis to add Bengali and Arithmetic to their normal teaching went in vain. In most of the maktabs the Mianjis were incapable of teaching the subjects

demanded of them. The result was that the majority of the Bengali Muslim children were deprived of learning the subjects of practical utility in the Maktabs. Naturally their primary education base remained very poor.

Keeping these disadvantages in view the Government of Bengal excluded the Quran Schools outright for their little or almost no secular value. Instead the government designed the maktabs in the following manner –

1) Maktabs which taught the rituals of Islam through the Urdu language.

2) Maktabs which taught Urdu and Persian and also made provision for teaching a

certain elementary standard in Bengali and arithmetic.

3) Maktabs which taught in vernacular language in addition to Urdu and Persian.[4]

After the implementation of this Government policy, it was found in the first few years that the number of Bengali Muslim students in the maktabs learning in vernacular language increased. But in the year 1897 there was a sharp fall in the attendance of Muslim students. That year was one of economic scarcity. Majority of the Muhammadan boys attending school came from rural background and agriculture was their chief means of livelihood. Due to crop failure resulting in subsequent fall in the standard of living the Muhammadan boys left school.

Poverty acted as a formidable factor in preventing the Bengali Muslim boys from attaining education. The comparative absence of a Muslim middle class – professional or business was a noticeable factor in Bengal. In the lower primary schools Mohammadan pupils were to Hindu pupils at 1 to 3, in upper primary schools as 1 to 5, in the middle schools 1 to 7, in high schools as 1 to 10, in colleges for general instruction as 1 to 24.[5]

The then government of Bengal realized the fact that the Muslim boys were not lacking in ability but in financial resources. This was proved when in 1887 a Muslim student Abdul Majid obtained the state scholarship to enable him to pursue his studies in an English University.[6]

In 1882 when the Indian Education Commission recommended special scholarships to be awarded to Muslim students at all stages of instruction, the Bengal government issued orders for the creation of twenty special scholarships of Rs. 7 a month each available for two years at any affiliated college of the Calcutta University to be awarded to Muslim students passing the entrance examination, ten of Rs. 10 a month, and ten of Rs. 7 a month to be awarded on the results of the First Arts Examination.

Another initiative taken by the 1882 Education Commission to encourage the Muslim to take up Government Secondary education was the introduction of the provision of free places in the schools managed by the Education Department, by District and Local Boards and by Municipalities. Therefore within its narrow financial limits and those of communal tolerance the Government of Bengal to a certain extent enabled the Muslims to attend higher Government schools.

But apart from financial problem, the Muslim students of Bengal had to confront a linguistic problem as well. Education in higher Government courses was imparted in English language which implied that the students should be bilingual i.e. proficient in English and their vernacular language. Many Indian Muslims at that time urged to learn Persian as Persian literature was quite popular in the 19th century India. Some Muslims also wished to learn Arabic which was the language of their religion. At the same time it was also true that without the knowledge of Persian and Arabic a Muslim boy found it very difficult to attain a prestigious position in the Muslim society. The large mass of

the Bengali Muslim spoke a language mixed with Persian and Arabic words known as Mussalman Bengali. But they too chose Urdu while educating their children. There was also another reason. As a Muslim put it, the language of the court and the country was Bengali while the language of their religion was Urdu and nobody was supposed to be a respectable Muslim unless he could speak the Urdu language properly. To the Muslim masses of Bengal consisting mainly of agriculturists, conservative by nature, education meant "first religious education, secondly moral education and lastly professional education. The result was that the Muslim children did not learn pure Bengali.

The Calcutta University commission of 1917 also noted another linguistic impediment in the way of a Muslim boy's attainment of education. It was the problem of multiple languages which a Muslim boy felt compelled to learn Arabic, Persian, Urdu, Bengali and lastly English. The burden was indeed overwhelming. Muslim youths got retarted.

There was another problem which a Bengali Muslim boy had to confront while attaining education. Children from the rural areas attending high schools had to find accommodation in towns. There was a lack of boarding house accommodation and parents were reluctant to send their children to towns unless proper guardians were available. For Muslim students the problem turned even more complicated as side by side professional education, they needed to take up religious education. So accommodation near a mosque was preferable.

In the absence of accommodation in school, the students needed to live in the house of their relatives. But the number of middle class Muslims in towns was comparatively far lower than middle class Hindus. As long as Persian was the court language most of the government officials and members of the Bar were Mohammadans and the Muhammadan students used to board and lodge with them. But with the abolition of Persian as the

court language the number of Muhammadan officers and lawyers got reduced considerably. So the Muslim students who used to live with these middle class Muslim officials were put to immense hardship. This naturally deterred the Muhammadans from sending their children to English schools in the towns.

It was not possible for the Government of Bengal or the 1882 Education Commission to eradicate all these impediments. The net result was that the Muslim boys lagged far behind the Hindu boys in the sphere of education in Bengal. But over and above everything else, the principal problem was put forward by the Muslim community's reluctance to accept the western ideas and institutions of the British Government. The vigour and strength of the Muslim cultural traditions, the demands of a religion which refused to recognize any activity of its followers as purely secular made an easy solution almost impossible.

Economic Backwardness of Muslim in Bengal

The census of 1901 showed that Muslims formed a large part of the agricultural population of Bengal. However most of them were landless tenants and not landholders. The proportion of landowners was only 170 in 10,000 in the case of Muslims as against 217 in the same number of Hindus.[7] On examining the economic condition of the Muslims in certain districts of Bengal where they comprised the majority, it is found that in every case the Muslims were the tenants and their zamindars were Hindu. Land was concentrated in the hands of the upper class Hindus exercising considerable authority over mainly Muslim tenants. In many cases the authority of the landlords did not remain confined to agricultural matters but extended beyond, entering the areas of private and personal affairs of the tenants as well. The tenants had to face humiliation and torture in the hands of the zamindars and in case the zamindar was an absentee, in the hands of their Naibs, literally speaking the deputies or managers. The majority of these Naibs were also Hindus.

The origin of the Pabna riots in 1873 was a striking example of the stained relationship between the Muslim peasants and the Hindu zamindars, in their absence the Hindu Naibs. It should however be noted that the conflict between the landlords and the tenants did not assume a communal colour until the 20th century. The partition of Bengal intensified the religious sentiments of both the communities. The fact that the landlords were mostly Hindus and they exploited their tenants who were mostly Muslims further aggravated the conflicting relation between the two.

Next to agriculture, it was the rural industry of handloom weaving which found majority Muslims as its employees. Though this industry was in a state of decline, it was found in 1891 that the total number of persons dependent on the cotton industries in the three provinces of Bengal, Bihar and Orissa was 511,665 males and 580,912 females.[8] These handloom weavers were found both amongst the Hindus and Muslims, only the names given to these two communities of weavers were different. The Hindu handloom weavers were called Tantis, while the Muslim weavers were called Jolahas or Momins.

The Jolahas occupied a very low social position among their own community. As a class they were poor and illiterate. To add to the misfortune of this class of Jolahas, the introduction of machine – made goods led to the decline of the handloom industry which consequently led to the deterioration of the economic condition of the Jolaha class. At the turn of the century the Swadeshi Movement which was directed towards reviving the industries of the country gave some relief. but there was no marked improvement in the condition of the weaving class. The main reason was the scarcity of capital. The weavers could be broadly divided into two categories – those who worked with their own capital and those who were dependent on the Mahajans for running their handloom industry. Majority of the Jolahas of Bengal belonged to the last category.

Like the rural Muslims of Bengal the condition of the urban Muslims was also miserable. By 1884, whether in Calcutta or in the district towns, the Muslims were beginning to feel the pressure of a Hindu domination. The position was that the Hindus in the towns had left the Muslims for behind in all walks of life. It was because the Hindus had taken up English education early and the Muslims late. The reason has been already stated in the section entitled the Educational Backwardness of the Muslims of Bengal. English educated Hindu youths, trained for the most part in missionary institutions from which the Muslims naturally stood aloof, poured into every government office and completely shut out the Muhammadans. Therefore at one time the government of Bengal was asked to adapt a unique measure of restoring the balance of the state patronage between the Hindus and Muslims by paying no regard in future to University degrees, instead the qualification of the candidates should be judged by an independent standard in which stamina and force of character should be given greater weight than academic degrees. This request in the form of a memorial was addressed to Lord Ripon. But before he could take any definite action in this matter, his Viceroyalty came to an end. It was during the time of his successor Lord Dufferin that the Resolution of the 15th July, 1885 was issued regarding the education and employment of the Muslims in the public services.

However the government of Bengal was against granting any special patronage in favour of the Muslims. Keeping the employment related disparity between the Hindus and Muslim in view the government of India declared that in those provinces where the Muhammadans did not receive their full share of state employment, the local governments and high courts would endeavour to redress this inequality as opportunity would offer and would impress upon the subordinate officers the importance of attending to this in their selection of candidates for appointments of the class referred to.[9]

The non-availability of Muslims in the public services could be attributed to two main factors – 1) Their backwardness in English education. In this regard the District Judge of Murshidabad noted that the poorer classes of Mohammadans lacked the necessary resources to provide English education to their children and on the other hand the children of wealthy Mohamadan Zamindar class with their habits of luxury and constitutional indolence felt reluctant to compete with the children of middle class Hindu families.

2) Most of the Hindu head ministerial officers, provided they had their own way, favoured men of their own religion.

If the Muslims were not employed in sufficient numbers in the lower ranks of the state services, their position was no better in the higher ranks. At that time the Indians had two avenues of admission into the civil service. Firstly through open competition in England to the covenanted civil service[10] and secondly through nomination to the statutory civil service.[11] The Bengali Hindus were the first among the Indians to compete for the covenanted civil service. But the Muslim community in Bengal was too backward in English education to compete successfully for the covenanted civil service. All Indians whether Hindu or Muslim stood at a grave disadvantage when in 1878 the maximum age for the candidates for the Indian Civil Service was reduced from 21 to 19. At 19, an Indian's knowledge of English was hardly sufficient to compete with the Englishmen. For the Muslims it was still more difficult to compete at such an early age.

The maximum age limit was however raised from 19 to 23 upon the recommendation of the Public Service Commission of 1887. But even this measure could in no way induce a Bengali Muslim candidate to compete for the covenanted rank.

In the sphere of trade and commerce also the condition of the Bengali Muslims was miserable. It was found in 1911 that among the Muslims of Bengal only 3,177 (out of 24 million)

derived sufficient wealth from trade, manufacturers, professions and property.

Educational backwardness made the Muslims slow to take part in social and political activities as a community. All these forms of backwardnesses leading to their political backwardness as well pushed the Muslim towards a sort of Pan Islamic movement. Due to their backwardness compared to their Hindu Bengali neighbors the Bengali Muslim community felt that emphasis on a revival of the spirit of Islam would enable them to get back their lost glory. It was this eagerness to return to the pure form of Islam that influenced the Bengali Muslims to claim a distinct and exclusive identity. This Pan Islamic trend in Bengal was further extended by some Muslim intellectuals in the later part of the 19th century like Altaf Hossain Hali, Shibli Nomani and Amir Ali Islam's spectacular part was glorified to whip up the religious sentiments of the Muslims. The Bengali literature was also replete with such sentiments. The extra territorial allegiance, though more emotional than real, fostered communal loyalties.[12]

The process of Islamisation was accelerated by several religious associations and Anjumans. The Muslim youth under the influence of the orthodox Islamic trend joined the Madrasahs and Maktabs in large numbers than even before. These youths did a lot to Islamise the rural masses. They published extensive literature to propagate the gospel of Islam among the rural masses. This literature put emphasis on observing ritual duties for attaining advantages in the next world. A section of the Muslim writers attempted to publish books in 'Muslamani or Islami Bengali' by using Arabic, Persian and Urdu words. This section of Bengali Muslims, being influenced by the sectarian ideas refused to identify themselves with Bengali culture and language.

The ideas of separatism in the social, economic and religious spheres got mixed with consciousness of self-development and this stood in the way of establishing composite Bengali consciousness.

Hindu Revivalism and Opposition To Some Mulsim Customs Leading To Communal Riots

The Indian National Congress was established in 1885 at the initiative of the Hindu Middle Class and became the 'accredited organ of the Nation'. However, the congress in the mid 19th Century till the early 20th Century showed certain Hindu revivalist trends in its movement organized against the British Government. The ideas of the Hindu revivalists viz Sri Ramkrishna Paramhansa (1836 – 1886) and Swami Vivekananda (1863 – 1902) was linked with the ideas of nationalism and the congress.[13] Balgangadhar Tilak (1858 – 1920) amalgamated the congress with the Hindu revivalist trend. Bipin Chandra Pal also contributed to this amalgamation. The literature produced by quite a number of Hindu Bengali intellectuals further enriched this Hindu Revivalism.

Some of the flourishing works of Bengali literature like the writings of Bankim Chandra Chattopadhyay especially Ananda Math stirred the nationalist sentiments of the Hindus but antagonized the Muslims. In Ananda Math, certain comments were made regarding the Muslims which the latter considered derogatory. Most of the landmark works including Rabindranath Tagore's 'Katha O Kahini' were interpreted by the Bengali Muslims as direct attack against the community. The exclusive Hindu Mela of 1867 and subsequent Hindu Nationalist Stirring gave rise to a parallel Muslim Nationalist outgrowth. Between 1870 and 1900 Muslim elite brought out papers like Mohammadi Akbar, Mussalman Bandhu, Islam Pracharak, Kohinoor and Nur-al-Islam. This parallel development represented tangential growth of Hindu and Muslim nationalism, which often took the shape of ugly communal outburst. All these communal developments led to the birth of two distinct faces of Bengali nationalism, linguistic and cultural nationalism which has absolutely nothing to do with religion and Islamic nationalism on the other hand.

The role of the militant Hindu revivalist movement, especially the Arya Samaj was responsible to a large extent for the growth of Muslim separatism in the Indian political life. During 1880s and 1890s the Arya Samajists attacked the Muslims with increasing intensity.[14]

The mentality of the nations go a long way in determining their character. The Bengal Renaissance which awakened the Hindus from centuries of sloth and slumber had also a canker. Various socio-religious movements aiming at purification of a society, brought along with it the idea of revivalism.

There is nothing wrong in eulogizing the past but a person who goes to the past automatically and inadvertently becomes an enemy of the present. The Arya Samaj no doubt gave a new vision to the Hindus through the concepts of self-help and self-reliance, but its shuddhi, sangathan, cow protection measures alienated the Muslim.[15]

The Hindu intelligentsia in the name of Hindu revivalism encouraged religious divisions and separatist tendencies. The Hindu symbols and myths adapted by the Indian National Congress under the pressure of the revivalist leadership created suspicion and fear in the minds of the Muslims.

The extremists' bid to equate nationalism with religion would have been laudable in case of singular society. But in the context of a plural society like India it sowed the seeds of Separatism between the Bengali Hindus and Bengali Muslims. The Hindu bias in literature, history, the projection of India as Mother Goddess made the Muslims allergic to Indian Ntionalism. Again the symbols like cow, saffron flag, sadhus, yogis, gods and temples were commandeered into the field of politics synchronizing nationalism with Hinduism during a crisis of identity, created by backwardness in the spheres of education, economy, politics, symbols came to bear greater meaning and significance than they otherwise did. The Muslims showed allergic reaction

to the national anthems like 'Banga Amar' and 'Bande Mataram'. The Bengali Muslims asserted that Banga Amar glorified only the Hindu Heroes excluding the Muslims ones, while Bande Mataram appeared idolatrous to them.

Actually the message of the Bengal renaissance was misunderstood by the Bengali Muslims. The message was to work for the enlightenment and welfare of mankind. Though the militant nationalist struggle in Bengal took a Hindu religious colour which alienated the Muslims, its basic objective was to send a message to everyone that the greatest need of the hour was to win freedom. The Hindu militant nationalist struggle, no matter however Hindu oriented it was – never denied the fact that all religions were true and that they were but different paths to reach the same goal and that was freedom.[16]

Conclusion

From the above discussion it becomes clear that the period highlighted in this chapter was that in which India as a whole reached a turning point. This period witnessed the birth and rapid development of Indian National Congress. It also saw the British Govt. coming to a decision about its ultimate aim for India. So, it may not be wrong to assume that this period was also the period of decision for the Muslims of United Bengal.

In the sphere of education the Bengali Muslim became fully aware of the need to make significant progress in their education. The British Government too realized in these years that there was indeed a Muslim education problem which required particular attention. But despite efforts made by the British Government and desire of the Muslim community to achieve significant progress in education, the goal remained quite distant due to certain practical problems, the primary being the Muslim people's eagerness to take in religious education first and progressive liberal and rational western education next. Secondly the factor of economic backwardness did present an obstacle

in the way of Muslim parents imparting quality western education to their children.

Educational backwardness coupled with economic disadvantage rendered the Bengali Muslims politically and socially inactive as well. As a result the Bengali Muslims were left with no other alternative but to resort to Islamic revivalism to win back their lost glory. Side by side, the amalgamation of the congress with the Hindu revivalist trend, the literary works produced by some Bengali intellectuals to stir up the nationalist sentiments among the people but antagonizing the Muslims by equating anti colonial nationalism with Hindu Nationalism certainly pushed the Bengali Muslims towards a desire for extra territorial allegiance and ultimately crave for partition.

Reference

1. Resolution of the Government of India, 11 March 1904, Paragraph 4, supplement

   to the Gazette of India, 12 March 1904.

2. Resolution of the Government of Bengal, 29 July 1882 Paragraph 1, supplement

   to the Calcutta Gazette, 30 July 1882. Also see Report of Indian Education

   Commission 1883, PP 496 – 97.

3. Quiquennial Review of Education in Bengal 1912 – 13 to 1916 – 17. P – 136

4. GRPI in Bengal 1889 – 90, P 94.

5. Ahmed Sufia, "The Economic Condition of the Muslim community In Bengal" in

   Muslim Community in Bengal 1884 – 1912, University Press Limited, May 1996,

   Dhaka, Pg 97.

6. Ibid; Pg 78
7. Report on the Census of Bengal 1881, Vol 1, Pg 179.
8. Banerjei N. N., Monographs On The Cotton Fabrics of Bengal, Pg 7.
9. Resolution of the Government of India, 15 July 1885, Paragraph 22.
10. The statutory Civil service was created in 1879 which was to be composed of

    Indian of high birth and fair education, nominated by the local governments and

    appointed on probation by the Government of India.
11. Ahmed Sufia, Opcit, Pg 115
12. Maitra Jayanti, "Muslim Politics In Bengal" cited in Sarkar J. N, ***Islam In Bengal***,

    (thirteenth to nineteenth century) 1992.
13. Lahiri Pradip Kumar, ***The Bengali Muslim Thought 1857 – 1947***, University

    Press Limited, 1991, Kolkata.
14. Rai Raghu (ed) The Punjab Story, Cited in Pradip Kumar Lahiri, 1991, Pg – 72
15. Ibid; Pg – 74

Place of Individual Liberty in Socio-Political Aspect

Kalpita Nandi*

ABSTRACT :

In this paper I am going to touch a very sensitive issue which has haunted philosophers in every era. The issue is: individual liberty. Although it is very difficult to define in one discussion. I would like to say that this is the most important key concept of socio-political philosophy. My aim is to analysesthe question: what is the place of individual liberty in different social structure in different times. I have always believed that for proper personality development individual liberty is essential. Individuals can flourish their liberty in a state where they are free to take decision consciously, not dictated by others. Keeping this realistic conviction in mind philosophers are worried and emphasized on liberty.

KEY WORDS : liberty, individual, society, politics, power, right, authority, state, tyranny, progress, equality.

It is true, from the history of the origin of the state/society, that liberty always suppressed, sometime by divine power, sometime by divine right, sometime by law and authority, even by the interference of state. So from every corner liberty is hampered. Then the reason behind the formation of state/society is no longer possible. It is to be said that replacement of individual liberty by anything will never be accepted. In this regard Mill's incisive view about individual liberty is important. According to him individual liberty plays an essential role to prevent social and political tyranny which existseven today in the name of public

*Asst. Professor, Dept. of Philoshophy, Kidderpore College.

interests. So for the interest of human being as well as society we must preserve individual liberty because society is also benefitted by this. Individual liberty is the window of a progressive society. Otherwise mankind as well as society became like a monad.

In this attempt first of all I shall try to state about the idea of the relation between individual and the state/society. Because within a state individual develops his personality by enjoying liberty. But the modern conception of this relationship differ from the age-old theory like divine origin theory, divine right theory etc. I shall then briefly discuss on the critique of these two theory and also try to show how social contract theory response. Kant's view is also important. I shall then concern Mill's view about the liberty of individual. What I want to demonstrate is that Mill's view in this regard is perhaps the possible accepted theory. After Mill I would like to state Sartre's idea about freedom in order to project the human reality or nature. Although in this regard many philosophers draw our attention for their unique type of realistic approach. Among them John Rawls's work, I. Berlin's view, A. Sen'sview are most relevant and important. And without their conspicuous view the various dimension of individual liberty still unfold to us.

It is usually believed that human being is social by nature. But there are so many needs that will remain unsatisfied in the natural state. So it is not due to man's nature alone but also due to his necessities that man lives in the society. The mind of man without society remains the mind of an infant at the age of adulthood. Thus society fulfils not only physical needs but also determines our mental equipments that develop our personality.

From the past days of origin of the civilization it has seen that the relation between society and individual is essential. This relationship is not one sided. Individual and society are interdependent. In the words of MclVer, "the individual and society

interact on one another and depend on one another," both are complimentary and supplementary to each other. But this conception is not maintained in the oldest theory concerning the primary origin of the state or society.

In the Divine origin theory the notion of divine power, supremacy, authority, command, tacit obedience are the base of this theory. There was no scope of individual action, conscience, opinion, freedom etc in the society. So the complimentary relation of individual and society was replaced by divine power of God. Hence individual liberty is not preserve at all in this state. Similarly the Divine Right theory advocates social tyranny, royal despotism, absolutism in contrast to the idea of consent, democracy, agreement etc. "Kings are breathing images of God upon earth"—this is the slogan of the doctrine of the divine right of king. Neither the idea of individual conscience, intellectual power nor the notion of Free State comes from both the theories. So both theories maximize socio-political tyranny by exclusion of individual liberty. These are some principle causes which brought about the decline of the theory are the rise of the contract theory.

From the last three century the contract is interpreted in various ways by its advocates. In 1651, Hobbes in his book *Leviathan*, considered individual liberty as secondary, conditional not necessary which is limited by the law. For him authority of power is much more important than individual liberty. Similarly in the *second treatise of government*, Locke also says about a democratic or constitutional government with unlimited authority where the effect of the rights of individual liberty was disappeared. In the mid of the 18th century Rousseau in his *Social Contract* starts with a very forceful piece of rhetoric: 'man is born free, and everywhere he is in chains'. He propounds a popular sovereignty where general will (not the will of majority) must be obligatory. Contract is basically enhance political authority rather than individual liberty. In his theory values of equality is secure even at the expense of liberty.

On the whole the theory has been used to justify the conception that government authority, if it is to be legitimate, must rest ultimately on the consent of the government. The weight of its influence in general has been in the direction of safeguarding the rights and liberties of the people and of checking the arbitrariness of rulers. But the idea of a covenant or agreement does not arise from the attitude of individual's freedom, but from the attitude of mere existence. It is to be said that in one side social contract theory brings the notion of individuality by safeguarding the rights and liberties and on the other side at the same time propounders of this theory replaced individual liberty in the name of law, authoritative power, and even equality. Therefore human liberty constantly restricted as well as hampered. As a result of this, social and political tyranny became extremely difficult to control which even frightening.

Kant, in his book the metaphysics of morals, said about the rights that people have or can acquire, and a state or society like this where there is no individual freedom, moral values, social values, and political values, the existence of mankind falls under a great troublesome situation. So the undue restriction over human freedom also hampered the moral aspect of mankind. Because morality without freedom and equality is wither. Not only social political or moral but in the economic field individual liberty losses its worth. As a result we have many revolutions against state. The Laissez theory arose as a natural reaction to the mischievous and meddlesome interference which characterize the relation of the state to the individual prior to the eighteenth century. So there was a clash between social control/ interference and individual liberty. Individualism is a reaction against state's tyrannical action.

In the mid of the 19th century this unsteady environment creates many problems related to the existence of mankind. That's why the concept of liberty widespread pervaded in all the great thinkers thought. Keeping the real importance of liberty

J.S.Mill comes up with his essay *on liberty*which deals with the value and nature of human freedom, of the conflicts that arise between the citizen and the state, and between the individual and the mass. Nor is he only concern with the need of freedom for individual development, he is equally occupied with discussing the value to society of freedom in individuals. Mill, in his book *On Liberty*, defined individual liberty as free, voluntary, undeceived consent and participation by which he gets affected and affects others. Liberty is akind of network of choices. Mill says about three types of liberty which must be regarded as right that are - liberty of thought – speaking and writing, liberty to pursuits one's own life by using opportunities and liberty to unite.

The most conspicuous feature in the history is the struggle between liberty and authority. For mill this never ending struggle cultivates social tyranny as a political or governmental tyranny, need to be controlled by the citizens. But the problem is that public opinion is always suppressed and represents as opposed to government interest. He was obstinate about silencing the expression of an opinion because that's leaded a way of suppression which is an evil. So not only the state, an unorganized but terrible power of general opinion is also the enemy of liberty.

As Mill stated that "the people who exercise the power are not always the same people with those over whom it is exercised". He apprehends that in the social liberty the majority who represents the will of the people may desire to oppress their indispensible part that the individual will. So there is scope of possibility to abuse the power against the individual liberty by the majority called tyranny of majority. Mill said that it increases when society executes wrong mandates rather than right one. Hence not only the state, an unorganized but terrible power of general opinion is also the enemy of liberty. Therefore protection against the limit of power of government is not enough, protection needs also against the tyranny of the prevailing opinion and feeling.

Mill tries to show that even in a democratic system individual liberty is not preserved in its true worth. He just tries to reconcile the concept of authority and liberty by enhancing the importance of individuality. But he also regards utility as the ultimate apple to all ethical matters. It seems that Mill's view on individual liberty goes against his principle of utilitarianism. Although he said that human worth as individuality is intrinsic in nature which must be conceded for greatest wellbeing.

After Mill, Rawls gives the most attractive shape of individual liberty in "*A theory of justice"* by reconciling freedom and equality. Rawls's intent was to demonstrate that the authentically valuable features of the common notion of freedom and equality could be integrated into a unity which he called justice as fairness.

So from the above discussion it is to be said that individual liberty has its own intrinsic worth, which cannot be replaced by anything whether by authority, power, majority, utility principle, collective opinion and even by equality. Although in the theory of 'divine origin', 'divine right' and 'social contract' liberty is hampered but somehow all these theories help the philosophers to come up with their new approaches. Mill draws our attention first by his approach towards human liberty with moral political ground that never approached before. Unlike Rousseau, Rawls's perception of both the concept in this regard is perhaps quite uniquely acceptable. Therefore the value of individual liberty remains important unconditionally till the end of the civilization.

BIBLIOGRAPHY:

1. Mill.J.S, On Liberty, London, Longman, Roberts & Green,1869
2. Russell. B, History of western philosophy,Routledge classics,1946
3. Bhusan,Vidya and Suchdeva.D.R, KitabMahal, Introduction to Sociology, Allahabad,1996.
4. Rawls John, Theory of Justice, Harvard University Press,1999

5. SenAmartya, Development As Freedom, Oxford University Press, 1999
6. SenAmartya, The Idea Of Justice, Penguin Books, 2009
7. Sen A &Willims B, Utilitarianism and Beyond, Cambridge University Press,1982
8. Sen A, Rationality and Freedom, Harvard University Press,2004
9. Skoble J Aeon &Machan R Tibor, Political Philosophy – Essential Selection, Prentice Hall, 1999.
10. Houseman & McPherson, Economic analysis, moral analysis and public philosophy, Cambridge University Press, 1996.
11. Plamenatz John, Man & Society (v -1), 1948

The British Colonial Motives Änd Its Impacts On The Silk Industry With Also Trade Of Malda Under Bengal Presidency: A Historical Analysis

Hoque Sabiruddin*

Abstract :

The present paper mainly focus about the sericulture related various types of colonial policy specially in the Malda region and Bengal in general. We are clearly aware that from the different historical sources about the impact of the British colonial policy on silk industry and trade of Malda under Bengal Presidency. A lot of people were engaged with happiness in the silk related various activities in the pre – British period, but under the colonial rule, they were fully depressed by the implication of the colonial policies. In this paper, try to search about the massive impact of the colonial hegemony on the silk industry and silk trade of Malda during the British colonial period, specially from Plassey war in 1757 to Charter Act of 1833.

Key Words :

Colonial motives, Malda, Silk Industry, Silk Trade, Diwani, Charter Act, Contract System, Filature Method, *Khamru* Reeling Process, *Khamru* Market, Gomastha, Banyan, Pykar, Dadni System.

Introduction :

Malda was played a very significant role in the silk industry with also trade from the very earliest times up to the pre – colonial phase. Most of the peoples engaged in the silk cultivation and industry with silk trade before colonial rule.1 During the pre –

* Research Scholar, Dept. of History, Vidyasagar University.

colonial period, silk made cloths of Malda were captured not only inland markets, with also European markets.2 The Mughal rulers were the great patronisers of the silk industry.3 But, colonial rulers were always carried on mercantile mentality in the trade and finance. So, they were totally different from the previous ruling classes.

Objectives of the Study:

The present study depends on many objectives, such as –

1. To realise the original condition of silk industry before colonial rule,

2. To aware about the difference between pre – colonial and colonial period on sericulture,

3. To know the various colonial policies on silk trade of Malda,

4. To observe the proper impact of the British colonial domination on sericulture sector of Malda.

Now, try to details discussion of British colonial policy on silk industry and trade of Malda as a region under Bengal Presidency.

Changing Condition since 1757 in the Silk Related Economy of Malda :

After the victory of the Plassey war in 1757, the English East India Company and their agents were played the lead role in the Bengal economy.4 The servants of the British Company were attached silk trade, besides the other industries, like as indigo, cotton etc.5 After the grant of Diwani in 1765, they misused their economic power. Also, the employee's of the Company were got highly benefit through the Charter Act of 1773 and 1793. They became the main trading classes in the silk related business in Bengal.

The agents of the English Company were fully involved in the silk industry of Malda, because Malda was famous for silk since very early times. Malda silk factory was established in 1680 for the different mercantile purposes.6 Malda silk factory

was acclaimed the main silk factory among the Luckypore and Chittagonj silk factory.7 So, the English Company's workers always preferred to the silken stuffs of Malda for their own profit.

British Colonial Motives Towards Silk Industry and Trade of Malda :

During the colonial rule, the English East India Company was wanted to get maximum profit from silk trade of Malda. One of the important matter is that, they were invest very low amount, but captured the huge profit from silk industry through their selfish policy. They used the native agents of the different classes due to establish of their domination on the enlarged silk industry of Malda under Bengal Presidency. The colonial ruler started 'contract system' to get limitless profit from sericulture sector of Malda.8 In 1770, the English Company founded silk filature factory to introduced European Method for silk reeling.9 Actually, they wanted more profit through the European silk reeling method, native named as *Khamru*.10 As per historical context, the colonial ruler was totally carried on highly mercantile motives for capturing huge profit from silk industry and trade of Malda from Plassey to Charter Act of 1833.

Nature of the Silk Trade of Malda During Colonial Period:

The silk trade of Malda divided into two parts – internal trade and external trade. In pre – colonial period, both the silk markets controlled by the native merchants, specially Marwaris. Mainly, the Marwaris were regulated to the internal market, which mentioned here *khamru* market.11 The silk trade maintained through the different routes, like as inland water ways, caravan routes etc. Most of the silk merchants preferred to the inland water ways due to its cheapness and high flexibility.12

The various types silken stuffs of Malda were exported Gujrat, Surat, Nagpore, Ahmeadabad, Benaras, Bombay, Agra for internal trade.13 Besides the internal market, silk cloths of Malda

were highly popular into the different European markets.14 The different classes of native intermediaries, such as, *Gomasthas,*15 *Banyans,*16 *Pykars*17 were played very significant role in the silk business of Malda.18 The colonial ruler and their supported trading community were getting economic utility from silk trade of Malda.

Impact of Industrial Revolution on silk industry and Trade of Malda :

The colonial ruler was passed the different Charter Acts for their own profit, specially after industrial revolution in England. They passed Charter Act of 1813 for the interest of the British manufacturers classes.19 They encouraged to the native cultivators for production of raw silk in Bengal and discouraged the production of silk made cloths. They were regularly supplied raw silk for various factories of England due to the industrial revolution. The colonial Government imposed highly tariff on export commodities from India to other countries and imposed preferential tariff on import goods from England in India. Due to the 'Dadni System',20 the native silk ryots21 were bounded to regularly supply of raw silk for development of textile productions in England. Due to the Colonial policy, both internal and external market were regulated by the British colonial ruler. The monopolistic policy of the English East India Company in the silk business was applicable up to the Charter Act of 1833.

Observation :

In conclusion, it can say that British colonial ruler were very different from their previous ruling classes in the Bengal Presidency. The colonial motives towards silk industry was very harmful in Malda as well as in Bengal. The native silk related entire community lost their economic stability due to colonial policy. Before the colonial rule, Malda was known as a main silk centric area in the Bengal Presidency. But, during the British colonial rule, people of Malda was lost their financial superiority

and fall into the below poverty level. In pre - colonial rule, those who were acclaimed as magnificent silk artisans community, but due to the colonial policy, they were engaged only 'survival for the fittest'.

Notes and References :

1. W.W.Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol.VII, Districts of Maldah, Rangpur and Dinajpur, Delhi : D K Publishing House, 1974, p.94.
2. Sailendra Kumar Bag, *The Changing Fortunes of the Bengal Silk Industry1757- 1833*, Calcutta : Manasi Press, 1989, p.79.
3. W.W.Hunter, pp.94 – 95.
4. Ranjan Chakrabarty, *Random Notes on Modern Indian History 1757 – 1947*, Kolkata : Reader Service, 2008, pp.33 – 34.
5. Ranjan Chakrabarty, Op.Cit., p.19.
6. Sushil Choudhury, *Trade and Commercial Organisation in Bengal 1660 – 1720*, Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyay, 1975, pp. 178 - 179.
7. Letter written by Thomas Henchman, Resident at Malda to the Warren Hastings, President and Governor and Council of Fort William, dated 25 October 1774, Fort William, 29 November 1774, Proceedings, Board of Trade, Commercial, Vol.No.1, 1774. West Bengal State Archives, Calcutta.
8. Letter written by William Aldersay and Members to the Honorable Warren Hastings, Governor General and the rest of the Gentleman of the Council, Fort William, 10 January 1777, Board of Trade, Commercial, Home Misc., Vol.No.40, 1777, National Archives of India, New Delhi.
9. G.E. Lambourn, *Bengal District Gazetteers – Malda*, Calcutta : The Bengal Secretariat Book Depot, 1918, p. 67.
10. Ibid.

11. G.E.Lambourn, Op.Cit., p. 68.
12. K.N.Chaudhuri, *The Trading World of Asia and East India Company (1660 – 1760)*, Cambridge : Cambridge University Press, 1978, p.345.
13. Tapan Roychaudhuri, *Bengal Under Akbar and Jahangir : An Introductory Study in Social History*, Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers, 1990, pp.178 – 189.
14. Sailendra Kumar Bag,Op.Cit., p.79.
15. *Gomasthas* were an agent under the Company.
16. *Banyans* were the native business partner of the European Merchants.
17. *Pykars* were an engaged as employees under broker in the silk business in Bengal.
18. Letter written by H.W.Drog, Resident at Cossimbazar to John Lumsden, President and Member of the Board of Trade, Fort William, dated 30 March 1809, Proceedings, Board of Trade, Commercial, 12 May 1809, Volume 232, West Bengal State Archives, Calcutta.
19. Narendra Krishna Sinha, *The Economic History of Bengal*, Vol.iii, Calcutta: Seagull Books, 1970, pp. 9 – 11.
20. *Dadni* Systen means advance money system.
21. Native Silk *Ryots* means inland silk cultivators.

Ebong Prantik is an International Refereed Multi-Disciplinary Journal Published Thrice a Year

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

http://ebongprantik.wordpress.com

₹ 200/-

Ebong Prantik
2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102
Ph : 9804923182, 9332358644
Email : ashis.jibonda.roy@gmail.com